ISSN-1813-0372

বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১৫

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১ সংখ্যা : ৪৪

প্রকাশনায়	:	বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
প্রকাশকাল	:	অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫
যোগাযোগ	:	বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০ ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২ e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com web : www.ilrcbd.org
সম্পাদনা বিভাগ	:	০১৭১৭-২২০৪৯৮ E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
বিপণন বিভাগ	:	ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭ E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
		সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং MSA 11051 বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ	:	ল' রিসার্চ সেন্টার
কম্পোজ	:	ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম	:	১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল "ইসলামী আইন ও বিচার" ৪৪ তম সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে এগারো বছর অতিক্রম করলো। এজন্যে আমরা রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের এই পথ পরিক্রমায় গবেষণা কাজে যারা সঙ্গ দিয়েছেন, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং যারা প্রকাশনা কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বিগত ৪৩ টি সংখ্যায় কলেজ-মাদরাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবি, ব্যাংকার, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষকসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার গবেষকদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দুই শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ এই জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইসলাম বিষয়ক যে কয়টি গবেষণা জার্নাল রয়েছে তন্মধ্যে "ইসলামী আইন ও বিচার" ইতোমধ্যেই সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের প্রথিতযশা গবেষক ও শিক্ষাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদ দক্ষহাতে জার্নালটি সম্পাদনা করায় এর মান নিয়ে শিক্ষাবিদ ও বোদ্ধামহল সন্তুষ্ট। জার্নালের এ সংখ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে ছয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

অপচয় ও অপব্যয় বর্তমান বিশ্বে সর্বগ্রাসী ব্যাধির মতো সংক্রমিত হচ্ছে। মানবজীবনের এমন কোন্ ক্ষেত্র নেই যেখানে অপচয় কিংবা অপব্যয় হচ্ছে না। অপচয় ও অপব্যয় প্রতিরোধে যত উদ্যোগই নেয়া হচ্ছে তার কোনটিই ফলপ্রসূ হচ্ছে না। আল-কুরআনে অপচয় ও অপব্যয়কে শুধু নিষিদ্ধই করা হয়নি অপব্যয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' আখ্যা দেয়া হয়েছে। "ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় ও অপব্যয় : কারণ, ক্ষতি ও প্রতিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখকদ্বয় অপচয় ও অপব্যয়ের পরিচয়, কারণ, অপচয় ও অপব্যয়ের কিছু দৃষ্টান্ত, এর ক্ষতিকর দিকসমূহ এবং অপচয়-অপব্যয় সমস্যা প্রতিকারের উপায় ইত্যাদি বিষয় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

অশ্লীলতা বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বিস্তৃত ও অন্যতম আলোচিত ইস্যু। আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে বর্তমান বিশ্বে অশ্লীলতার সয়লাব। অশ্লীলতা একটি চরম ঘৃণিত ও কুৎসিত কর্ম, যা ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সমগ্র সমাজ-রাষ্ট্রকে কলুষিত করে। বিভিন্ন মাধ্যমে অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার সমাজের ভিত্তিকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে। অশ্লীলতার প্রভাবে ছাত্র ও যুবসমাজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা খুবই স্পষ্ট ও ফলপ্রসূ। কুরআন ও হাদীসে অশ্লীলতা প্রতিরোধে যেসব বর্ণনা এসেছে সেগুলোর ভিত্তিতে "অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের

নির্দেশনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনও উদ্ধৃত হয়েছে। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক অশ্লীলতা প্রতিরোধে কিছু প্রস্তাব করেছেন। অশ্লীলতা যেভাবে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে তা প্রতিরোধ করতে ধর্মীয় অনুশাসনের বিকল্প নেই। তাই আমরা মনে করি প্রচলিত আইনের পাশাপাশি অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে অশ্লীলতার সয়লাব প্রতিরোধ করা সম্ভব।

নারী অধিকার বিষয়টি গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ সবচেয়ে আলোচিত বিষয়সমূহের অন্যতম। "ইসলাম অধিকার প্রদানে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করেছে"-এটি নারীবাদীদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে আপত্তিকর অভিযোগ। এই অভিযোগের জবাবে মুসলিম পণ্ডিতগণ অসংখ্য গবেষণাগ্রন্থ লিখে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম অধিকার প্রদানে নারী-পুরুষে বৈষম্য করেনি বরং নারীকে তার যথাযথ অধিকার দিয়ে স্বাবলম্বী ও মর্যাদাবান করেছে।

ইসলামী আইনে নারীর অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে উত্তরাধিকার বিষয়ক বিধি-বিধান। ইসলামের উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনসমূহের বেশির ভাগই আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। তারপরও কেউ কেউ এই ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। অথচ তারা জানেন না, আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন যখন উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেছে তখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতায় নারীকে মানুষই মনে করা হতো না। আর আরবের জাহিলী সমাজ কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। এমন এক প্রেক্ষাপটে ইসলাম নারীকে শুধু বাঁচার অধিকারই দেয়নি বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে পুরুষের চেয়েও বেশি অধিকার দিয়েছে। উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব কতটুকু তা নিয়ে বিভ্রান্তির প্রেক্ষাপটে "ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। এ প্রবন্ধটিতে লেখক কুরআনের দলীলের পাশাপাশি গাণিতিক হিসাব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন যে, কোন ক্ষেত্রে নারী কতটুকু সম্পদ পাবে। আর যেসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে হিস্যার তারতম্য রয়েছে তারও যৌক্তিক কারণ স্পষ্ট করা হয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ্ গবেষকদের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো মাকাসিদুশ শরী'আহ। মাকাসিদুশ শরী'আহ্র তিনটি স্তর রয়েছে। সেগুলো হলো, যরূরিয়্যাত, হাজিয়্যাত ও তাহসীনিয়্যাত। এই তিনটি স্তরের মধ্যে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত হচ্ছে হাজিয়্যাত। হাজিয়্যাতের নীতিমালার মাধ্যমেই শরী'আহ্র দৃষ্টিতে নীতিগতভাবে বৈধতা পাওয়ার নয় এমন কিছু ব্যবসাপদ্ধতি বৈধ

ঘোষণা করা হয়েছে। কনভেনশনাল ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে উসূলে ফিক্‌হের এই শাখাটির গুরুত্ব অপরিসীম। মাকাসিদের এই স্তরটি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে "মাকাসিদুশ শরী'আহ : হাজিয়্যাত প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধে। লেখক এ প্রবন্ধে মাকাসিদের সংজ্ঞা বর্ণনা করে এর প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন। এতদসঙ্গে মাকাসিদের দ্বিতীয় স্তর তথা হাজিয়্যাত-এর সংজ্ঞা দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

আর্থিক জামানত বর্তমান লেনদেনের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত একটি পদ্ধতি। দোকান, বাসা-বাড়ি, অফিস ইত্যাদি ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আর্থিক জামানত একটি আচরিত রীতি। এই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত হওয়ায় এ ব্যাপারে শরী'আহ্‌র নির্দেশনা জানা খুব জরুরী। এই প্রেক্ষাপটেই "ইজারায় আর্থিক জামানত পদ্ধতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে লেখক ইজারা ও জামানত পরিচিতি ও শরী'আহতে এর বৈধ্যতা আছে কিনা তা আলোচনা করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের পাশাপাশি প্রখ্যাত ফকীহ ও ফিকহগ্রন্থাবলির উদ্ধৃতির মাধ্যমে লেখক ইজারায় আর্থিক জামানত গ্রহণের বিভিন্ন প্রকার ও তার বিধিনাবলি বিশ্লেষণ করেছেন। ইজারায় আর্থিক জামানত পদ্ধতি এবং এক্ষেত্রে শরী'আহ্‌র নীতিমালা কী তা জানতে এ প্রবন্ধটি সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

নারীর জীবনে বৈধব্য একটি সংকট। এই সংকটকালে নারীর যেমন কিছু কর্তব্য আছে তেমন তার কিছু অধিকারও রয়েছে। ইসলাম বিধবা নারীকে যেসব অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে এবং তাদের ওপর যেসব কর্তব্য আরোপ করেছে তারই আলোচনা স্থান পেয়েছে "ইসলামী আইনে বিধবাদের অধিকার : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে। বাংলাদেশে বিধবা নারীরা যে অসুবিধা ও সমস্যার মুখোমুখি হন তার থেকে উত্তরণে ইসলামী আইনের নির্দেশনাসমূহ কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

"ইসলামী আইন ও বিচার" জার্নালের এই সংখ্যায় প্রকাশিত সবগুলো প্রবন্ধই গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযুগী। প্রবন্ধসমূহ একদিকে যেমন পাঠকবৃন্দকে অধিকার সচেতন করবে অপরদিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নেও সহায়ক হবে। অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাটিও পাঠকবৃন্দ সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আশা করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় ও অপব্যয় : কারণ, ক্ষতি ও প্রতিকার

মোস্তফা কামাল*
মোবারক হোসেন**

[**সারসংক্ষেপ** : *মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হলো আয় ও ব্যয়। জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আয় অনুযায়ী ব্যয় করা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন অপচয় ও অপব্যয় না করা। অথচ মানবসমাজে অপচয় ও অপব্যয় অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বেড়েছে। এর প্রভাবে ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রভাবিত হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে অপচয় ও অপব্যয়ের পরিচয়, কারণ, কিছু দৃষ্টান্ত, এর ক্ষতিকর দিকসমূহ, কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে অপচয় ও অপব্যয় বন্ধের নির্দেশনাসমূহ পেশ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্কে শরী'আহর নির্দেশনা জানা যাবে, যা জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে এই দূরারোগ্য ব্যাধি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নে সহায়ক হবে।]*

ভূমিকা

জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করা এবং সম্পদ ভোগ করার অনুমতি ও নির্দেশ প্রত্যেক ধর্ম ও সভ্যতায় রয়েছে। কিন্তু অন্য কোন ধর্ম বা সভ্যতায় ইসলামের মত আয়-ব্যয়কে নিয়মনীতির মধ্যে আনেনি। ইসলাম একদিকে যেমন হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছে, অপরদিকে হালাল উপায়ে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ হালাল পথে ও পদ্ধতিতে ব্যয় করারও নির্দেশ দিয়েছে। মানবসমাজে অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় আজ একটি বৈশ্বিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। অথচ ইসলাম এটিকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

ইসরাফ (الإسراف) ও তাবযীর (التبذير) এর অর্থ

আরবী "ইসরাফ" (الإسراف) শব্দের শাব্দিক অর্থ হল সীমালঙ্ঘন, অপচয়, অপব্যয়, অমিতব্যয়, বাড়াবাড়ি, মাত্রাতিরিক্ততা, অপরিমিতি।[১] কিন্তু কতিপয় বিজ্ঞ 'আলিম

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০
** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ৭৮

"ইসরাফ" শব্দকে ব্যয় করা ও খাওয়ার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ আলী আল-জুরজানী (৭৪০-৮১৬ হি.) রহ. "ইসরাফ"-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:

الإسراف إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس وتجاوز الحد في النفقة وقيل أن يأكل الرجل ما لا يحل له أو يأكل مما يحل له الاعتدال ومقدار الحاجة

ইসরাফ হল কোন নিকৃষ্ট বা তুচ্ছ উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। এও বলা হয়ে থাকে যে, ইসরাফ হল অবৈধ বস্তু ভক্ষণ করা অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করা।[২]

উপরোক্ত অর্থ থেকে ইসরাফের সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি যে, মানুষ তার কথা এবং কাজে সীমালঙ্ঘন করা। যদিও "ইসরাফ" শব্দটি খরচের সাথে ব্যবহার হওয়াই প্রসিদ্ধ।

ইসরাফ ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পদ সদকা করে দিলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।[৩]

ইসরাফ ধনী-দরিদ্র উভয়ের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আবার তা পরিমাণগত দিক দিয়ে ও পদ্ধতিগত দিক দিয়েও হয়ে থাকে। এ জন্যই বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সুফইয়ান আছ-ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) রহ. বলেন,

ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف ، وإن كان قليلا

তুমি আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে যা খরচ কর তাই ইসরাফ বা অপচয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।[৪]

ইবনু আব্বাস রা. বলেন, من أنفق درهما في غير حقه فهو سرف

যে ব্যক্তি অযথা কাজে এক দিরহামও খরচ করল তাই অপচয়।[৫]

অভিধানে "তাবযীর" অর্থ লেখা হয়েছে, অপচয়, অপব্যয়, বাজে খরচ, অমিতব্যয় ইত্যাদি।[৬] এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো-إلقاء البذر وطرحه অর্থাৎ বীজ ছিটানো ও নিক্ষেপ

---

২. আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি., পৃ. ৩৮

৩. আল-কুরআন, ০৬ : ১৪১

৪. রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত*, পৃ. ২৩০

৫. ইমাম কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহ্কামিল কুরআন*, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৮৫ খি./১৪০৫ হি., খ. ১৩, পৃ. ৭৩

৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

করা। এ থেকে শব্দটি রূপকভাবে অর্থসম্পদ অযথা ব্যয় করার অর্থে বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾ "তুমি অপব্যয় করবে না।"[৮]

ফকীহগণ "তাবযীর"কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,

عدم إحسان التصرف في المال ، وصرفه فيما لا ينبغي

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার না করা, তা অনুচিত কাজে ব্যয় করা।[৯]

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরাফের তুলনায় তাবযীর খাস বা নির্দিষ্ট। কেননা তাবযীর হল খারাপ কাজে সম্পদ ব্যয় করা, আর ইসরাফ হল যে কোন কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা।

আবার বিশিষ্ট ফাকীহ ইবনু আবিদীন (১১৯৮-১২৫২ হি.) রহ. অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরাফ ও তাবযীরের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

والتبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف والتحقيق أن بينهما فرقا وهو أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي والتبذير صرفه فيما لا ينبغي

তাবযীর শব্দটি ইসরাফের অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে, এটাই প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইসরাফ হল প্রয়োজনীয় কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা আর তাবযীর হল অপাত্রে খরচ করা।[১০]

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী (৩৬৪-৪৫০ হি.) রহ. বলেন,

والتبذير : الجهل بمواقع الحقوق ، والسرف الجهل بمقادير الحقوق

তাবযীর হলো খরচের যথার্থ স্থান সম্পর্কে অজ্ঞতা আর সারফ হলো খরচের যথার্থ পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতা।[১১]

অপচয় ও অপব্যয়ের কারণ

অপচয় ও অপব্যয়ের বহু কারণ রয়েছে। এর মধ্য থেকে কয়েকটি মৌলিক কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

---

৭. রাগিব ইস্পাহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

৮. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬

৯. ইমাম আন-নাবাভী, *তাহরীরু আলফাজিত তানবীহ*, দামেশক : দারুল কলম, ১৪০৮ হি., পৃ. ২০০

১০. ইবনু আবিদীন, *তাকমিলাতু হাশিয়াহ রদ্দুল মুহতার*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ খ্রি., খ. ০১, পৃ. ৩৫১

১১. আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী, *আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ-দীন*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৮ হি., পৃ. ১৮৭

০১. **দীন সম্পর্কে অপচয় ও অপব্যয়কারীর অজ্ঞতা :** যে দীন তাকে বিভিন্ন ভাবে অপচয় ও অপব্যয় করতে নিষেধ করেছে সেই দীন সম্পর্কে অপচয় ও অপব্যয়কারীর অজ্ঞতা অপচয় ও অপব্যয়ের অন্যতম কারণ। সে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানী হলে তার দ্বারা অপচয় করা সম্ভব হত না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾

তোমরা পানাহার করো, কিন্তু অপচয় করো না।[১২]

অপচয়কারীকে দুনিয়াতে আফসোস ও লজ্জিত অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾

এবং তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ের সাথে শৃঙ্খলিত করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।[১৩]

অপচয়কারীর জন্য আখিরাতে রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ - فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ - وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ - لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ - إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾

বামপার্শ্বস্থ লোক, কত না হতভাগ্য তারা! তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে এবং উত্তপ্ত পানিতে এবং ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। তারা ইতঃপূর্বে স্বাচ্ছন্দ্যশীল ছিল।[১৪]

অপচয়কারীর দীন সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলাফল হল, বৈধ জিনিস গ্রহণ করতে সে সীমালঙ্ঘন করে। আর এটাই তাকে শারীরিক ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই অলসতা তার উপর চেপে বসে। উমর রা. বলেন,

إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسد ، مورثة للسقم ، مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد ، وأبعد من السرف

তোমরা সীমাতিরিক্ত পানাহার থেকে সাবধান থাকো। কেননা অতিরিক্ত পানাহার শরীরের জন্য ক্ষতিকর, রোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক, সালাত থেকে অলসকারী। তোমরা

---

১২. আল-কুরআন, ০৭ : ৩১
১৩. আল-কুরআন, ১৭ : ২৯
১৪. আল-কুরআন, ৫৬ : ৪১-৪৫

পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, তা শরীরের জন্য উপকারী, তা দ্বারা অপচয় থেকেও বেঁচে থাকা যায়।[১৫]

০২. **পারিবারিক প্রভাব :** মানুষ শিশুকালে তার মা-বাবার আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মা-বাবা যদি অপচয়কারী হয়ে থাকে তাহলে সন্তানও অপচয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে। এ জন্যই স্বামী-স্ত্রীকে দীন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আর তা সন্তানের কল্যাণের জন্যই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[১৬]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

মেয়েদেরকে চারটি গুণ দেখে বিয়ে করা হয়; তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য্য এবং তার দীনদারী (ধর্ম পালন)। তুমি দীনদার মেয়েকে বিবাহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দাও। অন্যথায় তোমার ধ্বংস অনিবার্য।[১৭]

০৩. **বাস্তব জীবনের প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীনতা:** বেশিরভাগ মানুষ অর্থ-সম্পদ হাতে আসলেই হিসেব ছাড়া খরচ করে। সে একটি বার ভেবে দেখে না যে, দুনিয়ার জীবন সর্বাবস্থায় সমান থাকে না। আজকে হাতে অর্থ আছে কালকে নাও থাকতে পারে। তাই প্রত্যেকের উচিত, আল্লাহর দেয়া প্রতিটি নি'আমত যথাযথভাবে খরচ করা। আজকের অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করে বাকী অর্থ-সম্পদ ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখা উচিত। যা তার বিপদের সময় কাজে আসবে।

০৪. **দুঃখের পরে সুখ আসা :** অধিকাংশ মানুষ যারা অসচ্ছল ও দরিদ্রাবস্থায় দিনাতিপাত করে অথবা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করে তারা ঐ সময় ধৈর্য ধারণ করে। কিন্তু তারা যখন হঠাৎ করে ধনী হয়ে যায় কিংবা

---

[১৫] ইবনু মুফলিহ্ আল-মাকদিসী, *আল-আদাব আশ-শারইয়্যাহ ওয়াল মানহুল মারইয়্যাহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ্, ১৩৯১ হি., খ. ০২, পৃ. ২০১

[১৬] আল-কুরআন, ২৪ : ৩২

[১৭] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ্, পরিচ্ছেদ : আল-আকফাই ফিদ-দীন, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং- ৪৮০২

সুখের জীবন পায় তখন তারা জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ব্যয়ের ক্ষেত্রেও তারা বেহিসেবি হয়ে পড়ে। অপচয়ের এটিও একটি অন্যতম কারণ।

০৫. **অপচয়কারীদের সঙ্গ :** অপচয়ের অন্যতম কারণ হলো অপচয়কারীদের সঙ্গ ও সাহচর্য। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ তার সঙ্গীর চরিত্র গ্রহণ করে, তাই সঙ্গী অপচয়কারী হলে তার অন্যান্য সঙ্গীও অপচয়কারী হয়ে যাবে। নবী স. বলেছেন,

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

ব্যক্তি তার সঙ্গীর চরিত্র গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবে।[১৮]

০৬. **পরিচিতি ও খ্যাতির আশা করা :** অপচয়ের এটিও একটি কারণ যে, মানুষের সামনে নিজের খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করা। আর তখনই মানুষ অন্যের সামনে নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য তার সম্পদ অকাতরে খরচ করে। মূলত এর মাধ্যমে সে অপচয়ের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যা সম্পূর্ণ হারাম।

০৭. **অন্যের অন্ধ অনুসরণ :** মানুষ অন্যের অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের বড়ত্ব ও দানশীলতা প্রকাশের জন্য অপচয় করে থাকে।

০৮. **অপচয়ের ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন থাকা:** মানুষের জানা উচিৎ যে, অপচয় ও অপব্যয়ের পরিণাম মারাত্মক ও ভয়াবহ। মানুষ এই খবর জানে না কিংবা জানলেও এ সম্পর্কে উদাসীন। তাই সে অপচয় করে।

অপচয় ও অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত

ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানী রহ. অপচয় ও অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এভাবে, "তৃপ্ত হওয়ার পরেও খাওয়া, বৈধ জিনিস অতিরঞ্জিত করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য খাবার টেবিলে রাখা, রুটির সাইড বাদ দিয়ে শুধু মাঝখান থেকে খাওয়া, রুটির যে অংশ ফুলে উঠে শুধু সেই অংশটুকুই খাওয়া যেমনটি অনেক মূর্খ ব্যক্তিরা করে থাকে, কোন লোকমা হাত থেকে পড়ে গেলে তা না উঠানো ইত্যাদি।"[১৯]

ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী রহ. বলেন, "অপচয় হল, দুনিয়াতে কোন উপকার পাওয়া যায় না, আখিরাতেও কোন প্রতিদান পাওয়া যায় না, এমন কাজে সম্পদ ব্যয় করা। এর মাধ্যমে সে শুধু দুনিয়াতে অপমান ও আখিরাতে পাপের অংশীদার হয়। যেমন

---

১৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : মান ইউমারু আই ইউজালাসা, বৈরূত : দারুর কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-৪৮৩৫

১৯. মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানী, *আল-কাসব*, পৃ. ৭৯-৮৩

বিভিন্ন হারাম কাজে বিশেষ করে মদ পানের জন্য, অশ্লীল কাজে, নির্বোধ ব্যক্তিকে, গায়ক-গায়িকা, কৌতুক অভিনেতাকে টাকা-পয়সা দেওয়া। যা কবীরা গুনাহ। অপচয় হল, প্রয়োজন ছাড়াই বাড়ি নির্মাণ করা। অথচ সে ঐ বাড়িতে বসবাসই করবে না। অপচয় হল, খুব দামী-বিছানা ক্রয় করা, স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাবপত্র ব্যবহার করা। বাড়িতে বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত আসবাবপত্র রাখা ইত্যাদি।"[২০]

তিনি আরও বলেন, "তবে যে ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়া যায়, জ্ঞানী লোকদের নিকট প্রশংসা পাওয়া যায় তা দান হিসেবে গণ্য হবে, অপচয় নয়। এর পরিমাণ যতই বেশী হোক না কেন। পক্ষান্তরে ইসলাম বহির্ভূত কাজে ব্যয় করা, যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পাপী হিসেবে আর জ্ঞানীদের নিকট লাঞ্ছিত হিসেবে গণ্য হবে তাই অপচয় ও অপব্যয়, পরিমাণে তা যতই কম হোক না কেন।"[২১]

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ অবস্থা উক্ত অপচয়ের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। এখন আমরা অপচয় ও অপব্যয়ের আরো কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব :

০১. **ধূমপান ও নেশা গ্রহণ :** নিঃসন্দেহে যে কোন প্রকার ধূমপান ও নেশা গ্রহণ মানুষের জন্য বিধ্বংসী মারণাস্ত্র। কিন্তু ধূমপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের বাজার এত সয়লাব হয়েছে যে, মুসলিম বিশ্বেও মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হচ্ছে এই ধ্বংসাত্মক নেশা জাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। যদিও ইদানীং স্বাস্থ্য সচেতনার কারণে কিছু দেশে ধূমপানের পরিমাণ কমে এসেছে, কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে এর পরিমাণ বেড়েই চলেছে। মুসলিম বিশ্বও এর থেকে পিছিয়ে নেই। এক জরিপে দেখা গেছে, এশিয়ার ৩০% লোক ধূমপান করে। যা আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে।[২২] আরব দেশসমূহে প্রতি বছর মদের ব্যবসায় ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়।[২৩]

০২. **অতিভোজন :** মানুষ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে হজম করতে পারে না। ফলে সে বদহজমীতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অতিভোজনের ফলে ভুরি বেড়ে যায়, চর্বি বৃদ্ধি পায়। এতে শ্বাসকষ্ট হয়। হার্ট এ্যাটাকেরও সম্ভাবনা থাকে। ডায়রিয়াও হয়ে থাকে অতিভোজনের ফলে। আর এভাবেই মানুষ তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, মানসিকভাবেও সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

---

২০. আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী, *নাসীহাতুল মুলূক*, কুয়েত : মাকতাবাতুল ফালাহ্, ১৪০৩ হি., পৃ. ৩৬

২১. প্রাগুক্ত

২২. *মাজাল্লাতুন নূর*, আল-ইসতি'মার আস-সাজাইরী, সফর : ১৪১০ হিঃ, কুয়েত, পৃ. ৬-১০

২৩. *মাজাল্লাতুল ইকতিসাদ আল-ইসলামী*, দুবাই, সংখ্যা : ১৩১, শাওয়াল, ১৪১২. পৃ. ১৮

০৩. **খাদ্য ক্রয়ের সময় পূর্বের ভুল অভ্যাসের চর্চা :** অনেক সময় মানুষ তার অভ্যাসবশত অনেক জিনিস ক্রয় করে থাকে, অথচ এগুলোতে তার কোন প্রয়োজন নেই। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক মানুষ বেশি দামে লাল আপেল ক্রয় করে অথচ পুষ্টির ক্ষেত্রে লাল আপেলের কোন বিশেষত্ব নেই। আবার বিভিন্ন কোম্পানী তাদের নতুন পণ্য বিক্রির জন্য বিভিন্ন ধোঁকারও আশ্রয় নেয়, আর মানুষও বেশি দাম দিয়ে ক্রয় করে। এর মাধ্যমেও অপচয় ও অপব্যয় হয়। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ঘোষণার মাধ্যমেও মানুষকে ধোঁকায় নিমজ্জিত করা হয়। যেমন, দশটি পণ্য একসাথে ক্রয় করলে ২০০ টাকার প্রাইজবন্ড। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তির দশটি পণ্যের প্রয়োজন নেই সেও দশটি পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে অপচয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

০৪. **ফ্যাশন পাগল ও বিভিন্ন পণ্যের উদ্ভাবন :** দৈনন্দিন ফ্যাশনের পরিবর্তন ও বিভিন্ন পণ্যের উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষ সবচেয়ে বেশি অপচয়ে লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এসব দৈনন্দিন পরিবর্তিত ফ্যাশন তাদের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে না। বরং ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে তারা এতে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। আর তাদের মনে এই বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এই সব অত্যাধুনিক আসবাবপত্র গ্রহণ না করাটা আধুনিকায়ন ও প্রগতিশীলতার বিরোধিতা করে পিছনের দিকে ফিরে যাওয়ার নামান্তর। এই ফ্যাশনে বেশি আক্রান্ত হয়েছে নারীরা। যেমন নিত্য নতুন গাড়ির চাহিদা, নিত্য নতুন মোবাইল, আরো বিভিন্ন উন্নত আসবাবপত্রের আবিষ্কার হচ্ছে, যার মাধ্যমে মানুষ অপচয়ে নিমজ্জিত হচ্ছে। বিশেষ করে ধনী শ্রেণীরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তারা প্রতিনিয়ত এসব জিনিস অনেক টাকা ব্যয় করে পরিবর্তন করছে। আবার অনেকে কোন জিনিস ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ার পূর্বেই পরিত্যাগ করছে। বস্তুত এগুলো একদিকে অপচয়, অন্যদিকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংস করা।

অপচয় ও অপব্যয়ের ক্ষতিকর দিকসমূহ

অপচয় ও অপব্যয়ের যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এমনকি আন্তর্জাতিক ভারসাম্যকে হুমকির মুখে ফেলে। অযথা খরচ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে যেমন বিশৃঙখল করে, তেমনি ব্যক্তির আখিরাতকেও নষ্ট করে। নিম্নে অপব্যয় ও অপচয়ের কিছু ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হলো,

০১. **অপচয় ব্যক্তি ও পরিবারে বৈষম্য সৃষ্টি করে :** অপচয়ের জন্য মানুষ উপরি ইনকামের প্রতিঝুঁকে পড়ে। এ জন্য মানুষ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতেও

দ্বিধাবোধ করে না। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবী স. বলেছেন, كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ শরীর যা হারাম দ্বারা গঠিত, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।[২৪]

০২. **অপচয় তাড়াহুড়া ও অপরিনাম দর্শিতায় প্ররোচিত করে :** অপচয়ের মাধ্যমে মানুষ হঠাৎ করে যে কোন কাজ করে বসে, পরিণতির প্রতি চিন্তা করে না। মানুষ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না, আর এর পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ, যা মানুষকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। আর হিংসা-বিদ্বেষে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

০৩. **অপচয়ের মাধ্যেমে পাপের চর্চা হয় :** অপচয়ের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহার করে এবং তার আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সে মনে মনেও অনেক পাপের বিষয় গোপন করে রাখে, কারণ মানুষ পেটপুরে খেলেই সেখানে শয়তান অবস্থান গ্রহণ করে। এ জন্যই নবী স. বলেছেন :

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

"আদম সন্তান তার পেটের তুলনায় অন্য কোন খারাপ পাত্র ভর্তি করে না। মানুষের জন্য তো কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট, যা তার মেরুদণ্ডকে সোজা করে রাখবে। আর যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় আর এক-তৃতীয়াংশ নিশ্বাসের জন্য রাখবে।"[২৫]

০৪. **পরিবেশের উপর অপচয়ের প্রভাব :** পরিবেশের অবক্ষয়ের জন্য অপচয় অন্যতম প্রধান দায়ী। অপচয় বিভিন্ন প্রকার হলেও এর ক্ষতিকর প্রভাব একই, আর তা হল ক্ষেত-খামার ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের চরম অধঃপতন।

০৫. **অপচয় ও সৌখিনতা :** সৌখিনতা মানুষকে বিলাসী করে তোলে, যা মানুষকে খারাপ কাজে অগ্রগামী করে। সে সংগ্রাম ও ত্যাগের মানসিকতা পরিত্যাগ করে। যা মূলত অপচয়ের ফলাফল।

০৬. **অপচয় ও প্রবৃত্তি :** অপচয় হল মূলত প্রবৃত্তির অনুসরণ। প্রবৃত্তি যা আদেশ করে সে তাই করে, প্রবৃত্তি যা নিষেধ করে তা সে করে না। এক্ষেত্রে

---

২৪. ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪১০ হি., খ. ৫, পৃ. ৫৬, হাদীস নং-৫৭৫৯

২৫. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আয-যুহ্দ, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফী কারাহিয়াতি কাছরাতিল আকলি, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-২৩৮০। হাদীসটির সনদ হাসান।

আল্লাহ্‌র এই বাণীর অনুসরণই বুদ্ধিমানের কাজ, ﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾ "আর তুমি অপব্যয় করো না।"[২৬] যে ব্যক্তি এক মাসের খরচ এক দিনে ব্যয় করবে, তাকে বাকী দিনগুলোতে কষ্ট করতে হবে। আর যে ব্যক্তি ভারসাম্য রক্ষা করে চলবে সে প্রশান্ত চিত্তে দিন কাটাতে পারবে।

০৭. অপচয়ের মাধ্যমে মানুষ অন্যদের প্রতি যত্নহীন হয়ে পড়ে। তবে সে তখনই টের পায় যখন সে সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়। যেমন ইউসুফ আ. থেকে বর্ণিত আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনি তো কখনো পরিতৃপ্ত হয়ে খান না? তিনি বললেন, আমি যদি পরিতৃপ্ত হয়ে খাই তাহলে ক্ষুধা কী জ্বালা তা আমি ভুলে যাব।[২৭] অপচয়কারী তো আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে ভুলে থাকে, সে কিভাবে অন্যদের প্রতি গুরুত্ব দিবে?

অপচয় ও অপব্যয় : মানুষের বাস্তবতা

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে পানাহারের বিষয়টি পুরাতন। পানাহার-এর বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ, ফিক্‌হ-এর বিধানই মুসলিমদের অনুসরন করতে হবে। এমনকি ফিকহের কিতাবগুলোতে খাদ্য ও পানীয়ের জন্য আলাদা করে অধ্যায় রচিত হয়েছে। সেখানে হারাম খাদ্য গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে, খাদ্যের আদব রক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে পানাহার, অতিভোজন অপচয় ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আর এভাবেই খাদ্য ও পানীয়ের কোম্পানীগুলো অর্থ ধ্বংস করে চলছে। অতিভোজনের জন্যই বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট খোলা হচ্ছে। দুদিন পর পর নানা রকমের বিলাসী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট লোকদের অন্ধ অনুকরণের পিছনে মুসলিমরাও ছুটে চলছে। অধিকাংশ মানুষের জীবনেই তাদের জীবন, অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অপচয় করাটাই অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এমনকি আমাদের অনুষ্ঠানগুলো ব্যয়বহুল আর আমাদের রমযান মাস ইবাদত ও তাহাজ্জুদের পরিবর্তে অপচয়ের মৌসুমে পরিণত হয়েছে।

মানুষ তার জীবনে চলার পথে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকে। যেমন : আল্লাহর ইবাদত, পৃথিবী বসবাসযোগ্য করে গড়ে তোলা ও সেখানে কল্যাণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, এ জন্যই সে খাদ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী। যাতে করে সে বড় হয়, জীবনধারণ করতে পারে, চলাফেরা ও কাজ কর্ম করতে পারে। এ জন্য সে পানির প্রয়োজন বোধ করে। যেহেতু পানি ছাড়া মানুষ বেশি দিন বাঁচতে পারে না, সেহেতু বেঁচে থাকার তাগিদেই সে পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষী। ঠিক তদ্রূপ বিভিন্ন প্রকারের

---

২৬. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬

২৭. মুহাম্মাদ কুররা আলী, *সানাবিলুয যামান*, বৈরূত : মুআস্‌সাসাতু নাওফাল, ১৯৮৬, পৃ. ২৬৪

খাদ্য পরিমাণ মত গ্রহণ করা মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে শক্তিশালী ও সুস্থতা দান করে। আবার একই খাদ্য গ্রহণ করা মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। এ জন্যই বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য তাকে গ্রহণ করতে হয়, যেমন : পানীয়, সুগার, প্রোটিন, তেল, চর্বি, ভিটামিন সহ বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য। সুতরাং মানুষের ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণে যতটুকু পানাহারে প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, আর শরী'আতও তাই অনুমোদন দেয়।

জনাব মুহিউদ্দিন মাস্ত্র বলেছেন, "অতিভোজন যেমন রোগের জন্ম দেয়, ঠিক তেমনি একেবারেই খাদ্য গ্রহণ না করা রোগের জন্ম দেয় ও ইবাদতে অলসতা সৃষ্টি করে। আর পানাহারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা অন্তরকে প্রশান্তি দান করে। সুতরাং পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত।"[২৮]

নবী স.ও খাদ্যের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন,

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِى مِعًى وَاحِدٍ

কাফির ব্যক্তি খায় সাত পেটে আর মুমিন ব্যক্তি খায় এক পেটে।[২৯]

আর এতে অনেক উপকার বিদ্যমান, যেমন : সুস্থতা, সুন্দর বোধশক্তি, প্রখর মুখস্থ শক্তি, অল্প ঘুম, হালকা শরীর ইত্যাদি। এ জন্যই বিজ্ঞজনেরা বলেন, সবচেয়ে বড় ঔষধ হল পরিমাণ মত খাদ্য গ্রহণ করা। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত পানাহার মানুষকে সম্পদ অপচয়ে বাধ্য করে, তার চিন্তা-চেতনা সর্বদাই খাদ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এজন্য সে দীর্ঘ সময় বাজারে ব্যয় করে, আর বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ক্রয় করে। আলী রা. বলেন, ما جاع فقير إلا بما تمتع غني "যতটুকু খাদ্য দ্বারা ধনীরা বিলাসিতা করে ততটুকু খাদ্যই গরীবের ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।"[৩০] বলা হয়ে থাকে, البطنة تذهب الفطنة "অতিভোজন বুদ্ধিমত্তাকে লোপ করে দেয়।"[৩১]

উমর রা. বলেন,

إِيَّاكُمْ ، وَالْبِطْنَةَ فَإِنَّهَا مُكْسِلَةٌ عَنْ الصَّلاةِ مُؤْذِيَةٌ لِلْجِسْمِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي قُوتِكُمْ فَإِنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الأَشَرِ وَأَصَحُّ لِلْبَدَنِ وَأَقْوَى عَلَى الْعِبَادَةِ ، وَإِنَّ امْرَأً لَنْ يَهْلِكَ حَتَّى يُؤْثِرَ شَهْوَتَهُ عَلَى دِينِهِ

---

২৮. মুহিউদ্দীন মাস্ত্র, *আত-ত'আম ওয়াশ-শারাব বায়নাল ই'তিদাল ওয়াল ইসরাফ*, পৃ. ২৭

২৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আশরিবাহ্, পরিচ্ছেদ : আল-মু'মিনু ইয়'কুলু ফী মি'আন ওয়াহিদিন..., বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং-৫৪৯৩

৩০. আবুল কাসিম যামাখশরী, *রাবী'উল আবরার*, খ. ১, পৃ. ৪২০

৩১. আবুল কাসিম যামাখশরী, *আল-মুস্তকাছা ফী আমছালিল আরব*, খ. ১, পৃ. ৩০৪

তোমরা অতিভোজন থেকে বিরত থাকো, কেননা তা সালাতে অলসতা সৃষ্টি করে, শরীরকে অসুস্থ করে দেয় এবং তোমরা পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। কেননা তা ক্ষতি থেকে দূরে রাখে, শরীরের সুস্থতা বৃদ্ধি করে, ইবাদতে শক্তি যোগায়। নিশ্চয় কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি তার দীনের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার পূর্বে তার ধ্বংস হবে না।[৩২]

'উমার ইবনু হুবাইরা র. রোমের বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করল,

ما تعدون الأحمق فيكم ؟

তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা আহমক হিসেবে মনে কর?

রোমের বাদশাহ উত্তরে বললেন,

الذي يملأ بطنه من كل شيء يجد

যে ব্যক্তি সামনে যা পায় তাই দিয়ে তার পেট পূর্ণ করে।[৩৩]

ফারকাদ রহ. তার সাথীদের লক্ষ্য করে বলতেন,

إذا أكلتم فشدوا الأزر على أوساطكم ، وصغروا اللقم ، وشددوا المضغ ، ومصوا الماء مصا ، ولا يحل أحدكم إزاره فيتسع معاه ، وليأكل كل واحد من بين يديه .

তোমরা খাওয়ার সময় লুঙ্গি বেঁধে বসবে, লুকমা ছোট করবে, চিবিয়ে খাবে, পানি পান করবে, তোমাদের কেউ যেন তার লুঙ্গি ঢিলে করে না বসে, তাহলে তার পেট বড় হয়ে যাবে, আর তোমরা তোমাদের সামনে থেকে খাবে।[৩৪]

এ ব্যাপারে সকল চিকিৎসক একমত যে, রোগের প্রধান কারণ হল, খাওয়ার উপরে খাওয়া। এ জন্য ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আত-তিব্ আন-নাবাবী" গ্রন্থে খাদ্যের তিনটি স্তর নির্ধারণ করেছেন :

১ম স্তর : প্রয়োজনীয় পরিমাণ;

২য় স্তর : এমন পরিমাণ যা যথেষ্ট;

৩য় স্তর : অতিভোজন।[৩৫]

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রমযান মাসেও আমাদের পরিবারের খরচ বৃদ্ধি পায়। এমনকি এই মাসেও অতিভোজনের কারণে অনেকের বদহজমিও হয়। আল-হাসান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উমর রা. তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ রা.-এর

---

৩২. ইবনু মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩-৪

৩৩. আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, খ. ২, পৃ. ৪৭৪

৩৪. আবু নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল 'আরবী, ১৪০৫ হি., খ. ৬, পৃ. ২৮৯

৩৫. ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আত-ত্বিব আন-নববী*, পৃ. ৫৬

ঘরে প্রবেশ করে তার নিকট কিছু গোশত দেখতে পেলেন। এ সময় তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই গোশত কেন? আব্দুল্লাহ রা. বললেন, গোশত খেতে মন চেয়েছে, তাই। উমর রা. বললেন,

وكلما اشتهيت شيئا أكلته كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهاه

কোন জিনিসের প্রতি আসক্তি হলেই কি তোমাকে তা খেতে হবে? কোন ব্যক্তির জন্য অপচয় করাটা এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার মন যা চাইবে তাই সে খাবে।[৩৬]

নিঃসন্দেহে এই উক্তিটি একটি প্রজ্ঞাবহ অর্থনীতির নিয়ম বহন করে, বিশেষ করে বর্তমান যুগে আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, বিভিন্ন বস্তু ক্রয়ের জন্য নানাভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। একজন মনীষী মন্তব্য করেছেন যে, "আমরা সৌন্দর্যের জন্য যে পরিমাণ কাপড় ব্যবহার করি তা সারা বিশ্বের উলঙ্গদের জন্য যথেষ্ট হবে।" আলী গালুম বলেন, "আমাদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে যে, পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশী অপচয় করে, বিশেষ করে তাদের পোশাক এর ক্ষেত্রে। কিন্তু এমন কতক পুরুষ রয়েছে যারা মহিলাদের থেকেও বেশি অপচয় করে।" সাবাহ মালিকি বলেন, "অপচয়ের কারণ হল, মহিলারা অন্যের বাড়িতে, অন্যের গায়ে যে পোশাক, আসবাবপত্র দেখে তাই সে কিনতে চায়, যদিও এগুলোর তার প্রয়োজন নেই। এই মহিলাদের প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে অনেক সময় স্বামীর মাসিক বেতন এর বাইরে কর্জ করতে হয়। এভাবে অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংসের মুখে পড়ে।"[৩৭]

বিভিন্ন আকর্ষনীয় ভঙ্গিমায় বিলাসী পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার কারণে মানুষও সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বাস্তব অবস্থা বাদরিয়্যাহ মুতাইরী তুলে ধরেছেন এভাবে যে, অধিকাংশ মহিলা স্বামীর নিকট অনেক অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল আসবাবপত্র দাবী করে, আর স্বামীও স্ত্রীর মন যোগাতে সেসব অনৈতিক দাবীগুলো পূরণ করে। অথচ এগুলো অপচয় ও হারাম। মহিলাদের এই বিলাসিতার জন্য বিজ্ঞাপনী কোম্পানীগুলোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। পাশ্চাত্যের অনুকরণও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। আর অন্ধ অনুকরণ নির্দিষ্ট কোন স্থান বা জাতির মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। বরং সারা পৃথিবীতে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, যা পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব। মানুষের চাহিদা অপূরণীয়, বিশেষ করে বর্তমানে তা অতৃপ্ত। সে সব কিছুই চায়, তার সবকিছুতেই আসক্তি, সব রঙে সে রঙিন হতে চায়। আমরা আল্লাহর নিকট ঐ চক্ষু থেকে আশ্রয় চাই যা কাঁদে না, ঐ অন্তর থেকে যা ভয় করে না, ঐ নাফস থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, ঐ উদর থেকে যা পূরণ হয় না, আর ঐ দুআ থেকে যা কবুল হয় না।

---

৩৬. আলী ইবনু হুসামুদ্দীন আল-হিন্দী, *কানযুল উম্মাল*, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯ খ্রী., হাদীস নং-৩৫৯১৯

৩৭. যায়দ বিন মুহাম্মাদ আর-রুমানী, *'আল-ইসরাফ ওয়াত-তাবযীর'*, পৃ. ৩৬২

অপচয়, অপব্যয়, ধ্বংস, ক্ষয়, সামাজিক অবক্ষয়, মানুষের বদহজম, ভূরি মোটা হওয়া সহ সকল অসুবিধার মূলে হল কেনাটাকার সময় নিয়মের তোয়াক্কা না করা, খাবারের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি ইত্যাদি। ডাস্টবিনগুলোর অবস্থা থেকেই অনুমেয় হয় দৈনিক কত খাদ্য আমরা অপচয় করে চলছি, তুফানের মত আমরা সম্পদ অপচয় করছি। আর এভাবেই পশু চরিত্র আমাদের ব্যক্তিতে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করেছে। আর গরীব, মিসকিনরা হাহাকার করে মরছে। তুচ্ছ জিনিসকে কেন্দ্র করে আমরা যে পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করি তা যদি একত্রিত করি, তাহলে অনেক মানুষের জীবন চলার গতি পাবে, পৃথিবী বাসযোগ্য হয়ে ওঠবে, জীবন সুন্দর হবে। যদি আমরা একটু চিন্তাভাবনা করে খরচ করি তাহলে অপচয় ও দরিদ্রতা নামক পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি সমস্যার অবসান হবে। এভাবে দুটির মধ্যে সমতা বিধান করলে দুই সমস্যাই দূরীভূত হবে।

অপচয় ও অপব্যয়ের প্রতিকার

ইসলামের মূল সৌন্দর্যই হল মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। ইসলাম যেভাবে অপচয়কে নিষেধ করেছে তেমনি কৃপণতাকেও নিষেধ করে। এজন্যই কুরআন-সুন্নাহ্ মুসলিমদের পানাহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান, সৌন্দর্য, যোগাযোগের মাধ্যম, বিবাহ-শাদী সব কিছুতেই সীমারেখা চিহ্নিত করে দিয়েছে।

এ জন্যই একজন মুসলিমের খরচ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধানাবলি পালন করা আবশ্যক :

০১. অর্থনৈতিক দিক যেন মুমিনকে গ্রাস করে না ফেলে, বরং মুমিন ব্যক্তি তার আক্বীদা ও মুমিনের চরিত্র অনুযায়ী তার অর্থনীতি পরিচালনা করবে;
০২. মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে সম্পদ ব্যয় করা;
০৩. অহংকার বর্জন করা;
০৪. হারাম থেকে দূরে থাকা;
০৫. নিয়মতান্ত্রিকতা মেনে সম্পদ ব্যয় করা;
০৬. সচ্ছলতার সময় অসচ্ছল সময়ের জন্য সম্পদ জমা করে রাখা।

একজন মুসলিম শরী'আহ্ প্রণীত সীমারেখার মধ্যেই তার সম্পদ ব্যয় করবে। আর এটা ওঠানামা করবে বৈধ ও হারামের মাঝে।

প্রথমত, মধ্যমপন্থা অবলম্বন : এটি হল বৈধতার পর্যায়ে। যা অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি অবস্থান করা। সৌন্দর্য ও একেবারেই পরহেজগারিতার মধ্যবর্তী অবস্থান। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই নীতি গ্রহণ করে না। তারা সৌন্দর্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এক্ষেত্রে অনেকে অপচয়ও করে ফেলে অথচ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাও আল্লাহর বান্দাদের একটি গুণ।

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾

এবং তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।[৩৮]

নবী স. বলেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا غَيْرَ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ

তোমরা খাও, পান করো, দান-সদাকা করো এবং পরিধান করো, তবে অহঙ্কার ও অপচয় ব্যতীত।[৩৯]

দ্বিতীয়ত, সৌন্দর্য : সৌন্দর্য অবলম্বন করা অবশ্যই বৈধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾

এবং আপনার পালনকর্তার নি'য়ামতের কথা প্রকাশ করুন।[৪০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

হে বনী আদম, তোমরা সাজসজ্জা করে নাও প্রত্যেক নামাযের সময়, আর খাও, পান করো এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।[৪১]

নবী স. বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্যে তাঁর দেয়া নি'য়ামতের প্রভাব দেখতে ভালোবাসেন।[৪২]

তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষণীয় যে, সৌন্দর্য যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়। যেন অপচয়ের পর্যায়ে না পড়ে।

তৃতীয়ত, দুনিয়া বিমুখতা : এটি একটি প্রশংসনীয় গুণ। খুব কম মানুষই এই গুণে গুণান্বিত। এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন নবী-রাসূলগণ আ., অতঃপর পূর্বেকার অনেক আলিম, আর পরবর্তী যুগের খুব কম সংখ্যক লোক। এই কাজে অবশ্যই নিজের চাহিদাকে ত্যাগ করতে হয়, নিজের উপরে অপরকে প্রাধান্য দিতে হয়। আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা অনেক কল্যাণকর।

---

৩৮. আল-কুরআন, ২৫ : ৬৭

৩৯. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., হাদীস নং-৬৬৯৫; হাদীসটির সনদ হাসান।

৪০. আল-কুরআন, ৯৩ : ১১

৪১. আল-কুরআন, ০৭ : ৩১

৪২. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, অধ্যায় : আয-আদাব, পরিচ্ছেদ : ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বু আইইউরাআ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৮১৯। হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং ঈমান এনেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদের অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।[৪৩]

চতুর্থত, কৃপণতা : কৃপণতা করা হারাম। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর শত্রু, এমনকি তার নিজেরও শত্রু এবং প্রত্যেক ঐ জিনিসের শত্রু যা মানুষের উপকার করে। এভাবে যে সে নিজের প্রয়োজনও পূরণ করে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ﴾

যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে।[৪৪]

নবী স. বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا

তোমরা কৃপণতা থেকে দূরে থাকো; কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনেকেই কৃপণতার জন্য ধ্বংস হয়েছে। (শয়তান) তাদেরকে কৃপণতার আদেশ দিতো আর তারা কৃপণতা করতো, সে তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ দিলে তারা তা ছিন্ন করতো, এবং সে তাদেরকে পাপাচারে লিপ্ত হতে নির্দেশ দিলে তারা তাতে লিপ্ত হতো।[৪৫]

পঞ্চমত, অপচয় ও অপব্যয় : জীবনযাপনের সকল ক্ষেত্রেই অপচয় ও অপব্যয় করা হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।[৪৬]

---

৪৩. আল-কুরআন, ৫৯ : ০৯

৪৪. আল-কুরআন, ৪৭ : ৩৮

৪৫. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আশ-শুহ্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭০০

৪৬. আল-কুরআন, ০৬ : ১৪১

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।[৪৭]

নবী স. বলেন,

شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ غُذُّوا بِالنَّعِيمِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ

আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি তারা, যারা বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার খায় এবং বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে, আর লম্বা লম্বা কথা বলে বেড়ায়।[৪৮]

এ জন্য সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেধে দিয়েছে। যেমন :

১. বিলাসবহুল জীবনযাপন না করা। অর্থাৎ দুনিয়ার চাকচিক্য ও বিলাসিতাতে গা ভাসিয়ে না দেয়া। এ ধরনের বিলাসিতাকে ইসলাম সমর্থন করে না বরং নিন্দা করে। আর বিলাসিতার কারণেই আল্লাহর আযাব-গযব নেমে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾

যখন আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদের উদ্বুদ্ধ করি, অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর ওপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। পরিশেষে আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।[৪৯]

২. অপচয় না করা, আবার সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেয়া;

৩. সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা;

৪. হারাম ও ক্ষতিকর পণ্যদ্রব্যাদি বর্জন করা।

আল্লাহ তা'আলা ভাল জিনিসকে বৈধ করেছেন আর ক্ষতিকর ও নোংরা জিনিসকে হারাম করেছেন। আর ইসলামী আইনের একটি মৌলনীতি হল, لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ক্ষতি করবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এ মূলনীতিটি রাসূলুল্লাহ্ স.-এর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।[৫০]

---

৪৭. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭

৪৮. ইমাম আস-সুয়ূতী, *আল-ফাতহুল কাবীর ফী যাম্মিয যিয়াদাহ্ ইলাল জামি'ইস সগীর*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি., খ. ০২, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং- ৭০৬৪

৪৯. আল-কুরআন, ১৭ : ১৬

৫০. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৮৬৫; হাদীসটির সনদ হাসান।

৫. অহংকার না করা। যেহেতু ইসলাম ততটুকুই বৈধতা দিয়েছে যতটুকুর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। অহংকার প্রদর্শনের জন্য সম্পদ ব্যয়কে ইসলাম অনুমোদন করে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত, যার ওপর কিছু মাটি পড়ে ছিল। অতঃপর এর ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হল, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ওই বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।[৫১]

নবী স. বলেন,

لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ

যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড়কে ঝুলিয়ে টেনে টেনে পরে, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।[৫২]

৬. ক্ষুধার মাধ্যমে মানবীয় চাহিদাকে বশীভূত করা। মানুষ যখন পানাহারে পরিতৃপ্ত হয় তখন তার মধ্যে কুপ্রবৃত্তি জেগে ওঠে। আর ক্ষুধার্ত থাকলে তা শান্ত থাকে। আলিম ও ফকীহগণের কাছ থেকে ক্ষুধার বিভিন্ন উপকার বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

১. অন্তর পরিষ্কার থাকে ও অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়;
২. অহমিকা ও খারাবী দূরীভূত হয়;
৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ আপদের কথা স্মরণ হয়;
৪. কুপ্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখা যায়;
৫. ইবাদতে অধ্যবসায় বাড়ে;
৬. দান-সাদকা করতে মন চায়;

৭. ভালভাবে অর্থনীতি বুঝা যায়। অর্থাৎ আয়ের উৎস ও ব্যয়ের ক্ষেত্র সম্পর্কে ভালভাবে ধারণা রাখা। এক্ষেত্রে আমরা নবী জীবনের কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি, যা নবী স. তার সাহাবীদের জন্য পেশ করে ছিলেন :

---

৫১. আল-কুরআন, ০২ : ২৬৪
৫২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-লিবাস, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৪৪৬

ক. এই শিক্ষা গ্রহণ করা যে, অন্তরের অমুখাপেক্ষিতাই প্রকৃত অমুখাপেক্ষিতা। আবু যার রা. বলেন, নবী স. আমাকে বললেন, তুমি কি মনে করো যে, সম্পদ বেশি থাকাই ধনী হওয়া? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, তুমি কি মনে করো যে, সম্পদ কম থাকাই দরিদ্র্যতা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন নবী স. বললেন,

إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ

প্রকৃত ধনাঢ্যতা হচ্ছে অন্তরের ধনাঢ্যতা আর প্রকৃত দরিদ্রতা হচ্ছে অন্তরের দরিদ্রতা।[৫৩]

এর অর্থ হল আয়ের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা, ব্যয়ের সময় হিসাব করে ব্যয় করা।

খ. জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে ভালভাবে বুঝেশুনে করা। আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, কিছু সংখ্যক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদের দিলেন, পুনরায় তারা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তার নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন,

مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ....

আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে যাচনা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নি'আমত কাউকে দেওয়া হয়নি।[৫৪]

সুতরাং মনের দিক থেকে অল্পে তুষ্ট থাকা, হাত না পাতা, ধৈর্য ধারণ করা কাম্য। আর শারীরিক দিক থেকে কাম্য হল কাজ করে জীবিকা উপার্জন করা। নবী স. বলেন,

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বহণ করে বাজারে যায়, তারপর সেখানে তা বিক্রি করে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন, এটা মানুষের কাছে তার হাতপাতার চেয়ে উত্তম; কারণ মানুষ তাকে কিছু দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।[৫৫]

---

৫৩. ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯০, হাদীস নং-১০৩৪৪

৫৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আল-ইসতি'ফাফ 'আনিল মাসআলাহ্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪০০

৫৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আল-ইসতি'ফাফ 'আনিল মাসআলাহ্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪০২

এ জন্যই মক্কার লোকেরা ব্যবসা করত, আর মদীনার লোকেরা চাষাবাদ করত।

গ. নিজস্ব আয়ের মধ্যেই ব্যয় সীমাবদ্ধ করার শিক্ষা গ্রহণ করা। নবী স. বলেন,

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

একটি বিছানা স্বামীর জন্য, আরেকটি স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য আর চতুর্থটি শয়তানের জন্য।[৫৬]

এর উদ্দেশ্য হল খরচ কম করা, যাতে করে ঋণ করতে অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয়। নিজের সম্পদ দ্বারাই যেন যথেষ্ট হয়।

ঘ. দানের অভ্যাস করা। নবী স. বলেন,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। উপরের হাত হচ্ছে দাতা আর নিচের হাত হচ্ছে গ্রহীতা।[৫৭]

হাদীসের উদ্দেশ্য হল, সামাজিক বৈষম্য দূর করা, যাতে দানকারীর সংখ্যা বেশি হয়, গ্রহণকারীর সংখ্যা কম হয়।

এভাবেই নবী স. তার প্রিয় সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারাও সেই শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনে বাস্তবায়ন করেছিল। দাওয়াতের ময়দানে এর বিশাল প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সুতরাং আমাদের উচিৎ হল, উক্ত চরিত্রগুলো নিজেদের মধ্যে সন্নিবেশ ঘটানো, মুসলিমদের ঐ চরিত্র থেকে দূরে থাকা উচিৎ, যা উক্ত সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলোকে ধ্বংস করে। আর এটা জানা উচিৎ যে, যেই ব্যয় অহংকার প্রদর্শনের জন্য হয়ে থাকে তার মাধ্যমে শুধুমাত্র সমাজে দরিদ্রতাই বৃদ্ধি পায়। এ জন্য মুসলিমদের উচিৎ, সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। এর অর্থ এই নয় যে, নিজের আয় থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না বা আল্লাহর নি'আমত এর সদ্ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু ইসলাম চায়, মানুষ তার সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুক, ইসলাম ধোঁকাবাজিকে অপছন্দ করে আর অন্যের অনুকরণ করতে গিয়ে অপচয় করাকেও নিষেধ করে। অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর পানাহারের আয়োজন করা, বিশেষ করে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানাদিতে এগুলোর মাধ্যমে সম্পদ নষ্ট ও ভবিষ্যতের বিপদই ডেকে আনা হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি মুসলিমের সকল ক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিৎ।

---

৫৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-লিবাস ওয়ায-যীনাহ্‌, পরিচ্ছেদ : কারাহিয়াতু মা যাদা 'আলাল হাজাতি মিনাল ফিরাসি ওয়াল লিবাসি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৫৭৩

৫৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : লা সাদাকাতা ইল্লা 'আন যাহরি গিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৬২

উপসংহার

ইসলামী জীবনধারায় অপচয় ও অপ্‌ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম অপচয় ও অপব্যয়কে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। কোন মুসলিম কখনো তার অর্থ-সম্পদের সামান্য অংশও অপচয় কিংবা অপব্যয় করতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় এবং দরিদ্রতা দূরীকরণে আন্তর্জাতিকভাবে অপচয়-অপব্যয় বন্ধ করতে হবে। তবে এটা শুরু করতে হবে নিজের থেকে। ব্যক্তি যখন নিজে অপচয় ও অপব্যয় না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে পরকালে জবাবদিহিতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আয় এবং ব্যয় করবে, তখনই কেবল অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ হতে পারে, অন্যথায় নয়। তাই ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকলকেই এই অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করে তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থ ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এটাই শরী'আহর অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা

মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম*

[সার-সংক্ষেপ : আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং আনুগত্য প্রকাশ যে কোন সমাজের সমৃদ্ধির প্রধান ও পূর্বশর্ত। মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের নুবুওয়াতী জীবনে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে পর্যায়ক্রমে ইসলামী আইন-কানুন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রবর্তন করেছিলেন। মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইনের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও আইন মেনে চলার মানসিকতা তৈরি করে দিয়েছিলেন, যার ভিত্তিতে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পৃথিবী সর্বপ্রথম কল্যাণরাষ্ট্র। যা অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে ধারাবাহিকভাবে অশ্লীলতার পরিচয়, অশ্লীলতার বিভিন্ন ধরন, প্রচার-প্রসারের মাধ্যম ও কারণ, অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের সুনিপুণ ও বিজ্ঞানসম্মত বিধান এবং আধুনিক যুগে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশেষ করে যুবসমাজে অশ্লীলতা প্রসারে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।]

ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিরোধ করাই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। তাই ইসলামী সমাজ অপরাধ সংঘটনের পরই কেবল তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ নেয় না; বরং অপরাধের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে আগেভাগেই বন্ধ করে দেয়। এ উদ্দেশ্যে যে, তা মানুষের জৈবিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যেমন যথোচিতভাবে পূরণ করে, তেমনি ব্যাপক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে অপরাধের বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে তোলে। এর পরে কেউ অপরাধে লিপ্ত হলে, সমাজের মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করতে চাইলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণেও দ্বিধাবোধ করে না। সমাজে অশ্লীলতা একটি চরম ঘৃণিত, মানবতাবিরোধী ও কুৎসিত সামাজিক অপরাধ, যা সমাজ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে কলুষিত ও বিপন্ন করে। এটি সকল সভ্য জাতির কাছে অত্যন্ত কদর্য ও বীভৎস রূপে চিহ্নিত। সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী এ অপরাধ হতে ব্যক্তি ও সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ নানা পদ্ধতি ও আইন-কানুন রচনা করেছেন।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে এ হীন অপরাধ দূর করা সম্ভব হচ্ছে না; বরং অপরাধ দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সমাজে অপরাধীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র কল্যাণময় বিধান হিসাবে অশ্লীলতামুক্ত সমাজ গঠনেরও এক চমৎকার পদ্ধতি উল্লেখ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অশ্লীলতা প্রতিরোধে ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অশ্লীলতার সংজ্ঞা

অশ্লীলতার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে, فضح، فحش، مجون، خلع ইত্যাদি।[১] এ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো : অসম্মান করা, লাঞ্ছিত করা, সম্ভ্রম নষ্ট করা, উন্মুক্ত করা, খারাপ কাজ করা, ব্যভিচার করা, নির্লজ্জ হওয়া ইত্যাদি।[২] ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হলো : Vulgarity, Obscenity, Wantonness, Smutty, Loalhsome.[৩]

মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা এটিকে فاحشة শব্দে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾

আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে...।[৪]

আলোচ্য আয়াতে فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা সাধারণতভাবে অশ্লীল কাজকেই বুঝানো হয়েছে। তবে তা দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা স্পষ্টত বুঝা যায় মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে জাবির রা. বলেন : আলোচ্য আয়াতে فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা ব্যভিচার করা বুঝানো হয়েছে।[৫] ইব্ন আব্বাস রা. বলেন, আলোচ্য আয়াতের فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা অবাধ্যতাকে বুঝানো হয়েছে।[৬]

---

১. আবূ তাহের মেসবাহ, *আল-মানার [বাংলা-আরবী অভিধান]*, ঢাকা : মোহাম্মাদী লাইব্রেরী, ১৯৯৮, পৃ. ৮৭

২. ড. এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী [সম্পাদিত], *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৬৮

৩. Md. Kamruzzaman Khan, *Oxford Advanced Learner's Dictionary [Bangali to English]*, Dhaka : Oxford Press & Publication, 2009, p. 87

৪. আল-কুরআন, ৩ : ১৩৫

৫. আবু মুহাম্মদ ইব্ন মাসউদ মহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, বৈরূত : দারু তায়্যিব, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭, খ. ৩, পৃ. ২২৩।

৬. 'আব্দুল্লাহ বিন আহমদ, *তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরি ইব্ন 'আব্বাস*, করাচী : কাদিমী কুতুবখানা, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৭১; আবুল হাসান 'আলী ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম 'উমর আল-খাযিন, *লুবাবত তা'বীল ফী মা'আনিয়াত তানযীল 'তাফসীর আল-খাযিন*, বৈরূত : দারুল মারিফাহ, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ২০১;

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾

আর যখন তারা কোনো অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরও এর ওপর পেয়েছি এবং স্বয়ং আল্লাহও আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন। (আল-কুরআন, ৭: ২৮)

আলোচ্য আয়াতে فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে- এ বিষয়ে বিজ্ঞ তাফসীরকারকদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন- ইবনু 'আব্বাস ও মুজাহিদ রা. প্রমুখের মতে, এখানে তা দ্বারা উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা উদ্দেশ্য। 'আতা রা.-এর মতে, শিরক করা এবং যে কোন নিলর্জ্জ অপকর্ম করা।[৭]

ভারতীয় পেনাল কোডে বলা হয়েছে, বই, পুস্তিকা, কাগজ, লেখা, আঁকা, ছবি, বর্ণনা, মূর্তি বা অন্য কোনো বস্তু অশ্লীল বলে বিবেচিত হবে, যদি এটি লাম্পট্যজনক হয় (lascivious) বা এটি কামপ্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করে (appeals to the pruriest interest) অথবা সামগ্রিক বিচারে এটি লোকের মনকে কলুষিত (deprave) ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত (corrupt) করে।

ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধারায় অশ্লীলতার কোনো পরিষ্কার সংজ্ঞা নেই বলে অনেকে দাবী করেন। যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে- সেটা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শ্লীলতা-অশ্লীলতা অনেকটাই ব্যক্তি-নির্ভর। একজনের কাছে যা অশ্লীল, আরেকজনের কাছে তা নাও হতে পারে। অশ্লীলতার ব্যাখ্যাই যেখানে অস্পষ্ট, তার উপর ভিত্তি করে শাস্তি আরোপ করা যায় কি? রণজিত ডি উদেশী বনাম মহারাষ্ট্র সরকার মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিলো। সুপ্রিমকোর্ট অবশ্য সেটাকে নাকচ করে। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের মত হলো : অশ্লীলতা শব্দটি মোটেই অস্পষ্ট নয়। (১) এটি অনুভূতিপ্রবণ মনকে কলুষিত করে ও নৈতিক অধঃপতন ঘটায়; (২) এটি নোংরা ও লাম্পট্য চিন্তা মাথায় আনে; (৩) এটা অকৃত্রিম পর্নোগ্রাফি; (৪) এটি কাম উদ্রেককারী; (৫) এটি যৌন-বিষয়ক কুচিন্তা মনের মধ্যে আনে; (৬) সামাজিকভাবে গ্রাহ্য যে সীমারেখা-তা ছাড়িয়ে যায়।[৮]

---

[৭] আবু মুহাম্মদ ইবন মাসউদ মহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, বৈরূত : দারু তায়্যিব, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭, খ. ৩, পৃ. ২২৩; ইবন জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৩৭৭।

[৮] ১৮৬০ সালের ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধারা

তবুও কোন বই বা ছবি অশ্লীল আর কোনটি নয়- সে নিয়ে বাদ-বিবাদ চলবেই। প্রসঙ্গত আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে শারদীয়া (১৩৭৪) দেশে প্রকাশিত সমরেশ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রজাপতি' অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিলো। ১৯৬৮ সালে উপন্যাসটি অশ্লীল বলে নিষিদ্ধ হোক বলে মামলা করেন অমল মিত্র বলে একজন এ্যাডভোকেট। সরকার

সমাজে প্রচলিত অশ্লীলতার ধরন ও প্রতিরোধে ইসলামী আইন

অশ্লীলতার ধরন ও মাধ্যম বিভিন্নভাবে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো:

এক. ব্যভিচার

ব্যভিচার একটি চরম ঘৃণিত, মানবতাবিরোধী ও কুৎসিত সামাজিক অপরাধ, যা সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে কলুষিত ও বিপন্ন করে। ব্যভিচার সকল সভ্য জাতির কাছে অত্যন্ত কদর্য ও বীভৎস হিসেবে চিহ্নিত। সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী এই জঘন্য অপরাধ হতে ব্যক্তি ও সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা নানা পদ্ধতি ও আইন রচনা করেছেন । কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে এ হীন অপরাধ দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র কল্যাণময় বিধান হিসেবে ব্যভিচার বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে।

ব্যভিচার পরিচিতি : ব্যভিচারের আরবী প্রতিশব্দ যিনা (زنا)। এটির আভিধানিক অর্থ হলো, অবৈধ যৌন সম্ভোগ, পাপাচার, সংকীর্ণতা, ঊর্ধ্বারোহন ইত্যাদি।[৯] ব্যভিচার বা যিনা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, Adultery; going astray; deviation from the proper cowrse; Transgression; exception to a rule.[10]

ইসলামী আইনের পরিভাষায়, যিনা-ব্যভিচার হলো অবৈধ সংগমের নাম, যা বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।

ইবনে রুশদ আল-হাফীদ রহ. যিনার পারিভাষিক অর্থ প্রসঙ্গে বলেন :

أما الزنا فهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين

পক্ষও তাঁকে সমর্থন করে। প্রথমে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এর বিচার হয়। কোর্ট রায় দেয় উপন্যাসটি অশ্লীল এবং লেখক ও প্রকাশকের ২০১ টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে দুমাস কারাদণ্ড। আপিলের মেয়াদ পার হয়ে গেলে দেশ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার ১৭৪ থেকে ২২৬ পাতা নষ্ট করে ফেলারও বিধান কোর্ট দেয়।

৯. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ৫, পৃ. ২৩১; ইবন মানযূর, *লিসানুল 'আরব,* বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৯৩ খ্রী./১৪১৩ হি., খ. ৬, পৃ. ৮৭; আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাকরী আল-ফুয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমীয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রী., খ. ১, পৃ. ২৫৭; আল-ফাইরুযাবাদী, *আল্-কামূসুল মুহীত,* বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪১৩ হি./১৯৯১ খ্রী., খ. ১, পৃ. ২৩১; মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল্-কুরতুবী, *আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন,* বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ খ্রী., খ. ১২, পৃ. ২২৮

১০. Ashu Tosh Dev, *Students' Favourite Dictionary*, Bangala to English, Calcutta: Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 1986, p. 973

ব্যভিচার এমন যৌন মিলনকে বলা হয় যা বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন কিংবা সন্দেহজনিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া ও দাসত্বের মালিকানা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়।[১১]

অতএব ব্যভিচার বা যিনা হলো, বৈবাহিক কিংবা দাসত্বের মালিকানা সূত্র ছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর মাঝে যৌন সঙ্গম হওয়া।

ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামী আইন : ইসলামী শরী'আতের বিধানে যিনা-ব্যভিচার একটি গুরুতর দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ অশ্লীল-অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

তোমরা যিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যাবে না। নিশ্চয়ই এটি একটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।[১২]

আর যারা এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে তাদের উভয়ের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে, আল্লাহ্র দীনের (আদেশ কার্যকর করার) ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী পুরুষ কোন ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা কোন মুশরিক নারী ব্যতীত অন্য কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিয়ে করবে না, (অনুরূপভাবে) ব্যভিচারিণী মহিলাকে কোন ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা কোন মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কোন সৎ লোক বিয়ে করবে না। মু'মিনদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১৩]

---

১১. ইবন রুশদ আল-হাফীদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহাইয়াতিল মুকতাসিদ*, বৈরূত : মা'রিফাহ, ১৯৭৮ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৪৩৩; ইবন হাযম যেনার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন :

فإنه وطئ من لا يحل النظر إلى مجردها مع العلم بالتحريم

'যিনা হলো হারাম জেনে যার দিকে তাকানোও বৈধ নয়, তার সাথে সংগম করা,।'
-ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা*, মিশরঃ আল-জমহূরীয়া 'আরাবীয়াহ, ১৯৭০ খ্রি./১৩৮৭ হি., খ. ১১, পৃ. ২২৯

১২. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২

১৩. আল-কুরআন, ২৪ : ২-৩

এ সম্পর্কে অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت

আবূ হুরায়রা ও যাইদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন : এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ করে আপনাকে বলছি যে, আপনি আল্লাহর তা'আলার কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করবেন। আর অধিকতর বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ বলল : আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করুন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ঘটনাটি বলার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন। সে বলল : আমার ছেলে এই ব্যক্তির শ্রমিক ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আর আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, আমার ছেলেকে রজম করা হবে। আমি তাকে এর বিনিময়ে একশত বকরী ও একটি বাঁদী দিয়েছি। আর আমি আলেমদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তারা আমাকে জানালেন যে, তার জন্য একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসন, আর এ মহিলার জন্য রজম নির্ধারিত শাস্তি। মহানবী স.

এখানে উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতে অবিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত। অন্যথায় বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনায় লিপ্ত হওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন :

خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة

আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো, আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ্ নারীদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও পাথর দ্বারা রজম। আর যুবক-যুবতী (অবিবাহিত) যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসন।

-ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., অধ্যায় ; আল-হুদূদ, পরিচ্ছেদ : হাদ্দুয যিনা, খ. ৫, পৃ. ৫৯, হাদীস নং-৩২০০; ইমাম তিরমিযী, আবূ, *আস-সুনান*, বৈরূত, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি, পরিচ্ছেদ : মা জা'আ ফী হাদ্দির রজম, খ. ৫, পৃ. ৩৩৮, হাদীস নং-১৩৫৪; ইব্‌ন হিব্বান মুহাম্মদ আল-বুস্তী, *আস-সাহীহ*, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি., পরিচ্ছেদ : যিনা ওয়া হাদ্দুহু, খ.১৮, পৃ. ৩৫৪, হাদীস নং-৪৫০৪

বললেন : আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। বকরী ও বাঁদী ফেরত দেয়া হলো। তোমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং একবছর নির্বাসন দেয়া হবে। হে উনাইছ! তুমি সকাল বেলা এর স্ত্রীর নিকট যাবে, যদি সে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করবে। বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর সে (উনাইছ) সকালে তার নিকট গেল এবং স্বীকারোক্তি করল। আর রাসূলুল্লাহ্ স. এর নির্দেশ মত তাকে রজম করা হল।[১৪]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, অবিবাহিত অপরাধীর শাস্তি বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত অপরাধীর শাস্তি রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বিচারিক দৃষ্টান্তও বিদ্যমান রয়েছে।

দুই. পতিতাবৃত্তি

অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সমাধা করা গর্হিত কাজ। যৌনকার্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম। এর সমাধান না হলে মানুষ তার জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

পতিতাবৃত্তি পরিচিতি : নারীদের মধ্যে যারা দেহ ব্যবসায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা মুক্তভাবে জড়িত তাদেরকে যৌনকর্মী বলে। আরবীতে এ অপকর্মকে بِغَاء বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৫]

পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলামী আইন : কোন নারী স্বেচ্ছায় নিজেকে দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত করতে পারবে না। এটা হারাম তথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্য কেউ তাকে দিয়ে দেহ ব্যবসায় পরিচালনা করতে চাইলে তাও হারাম। আল কুরআনে এসেছে,

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾

তোমরা যুবতীদের দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হতে বাধ্য করো না।[১৬]

ইসলাম ব্যভিচার ও দেহ ব্যবসায়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পর্ণোগ্রাফি তৈরি অশ্লীলতা ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচায়ক। তরুণ-যুব-শিশুর চরিত্র হনন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম যে কোন প্রকার অশ্লীলতার নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছে।

---

১৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-হুদূদ, পরিচ্ছেদ : মান ই'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৭১, হাদীস নং ৩২১০; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* পরিচ্ছেদ : মা যা'আ ফী দির'ইল হাদ্দ, খ. ৫, পৃ. ৩৩০, হাদীস নং ১৩৪৯; ইমাম দারেমী, *আস-সুনান,* পরিচ্ছেদ : ই'তিরাফ বিয-যিনা, খ.৭, পৃ. ১৪৮, হাদীস নং ২৩৭২

১৫. ইব্ন মানযূর, *লিসানুল 'আরব,* প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৭৫

১৬. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

তোমরা কোন ধরনের প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়ো না।[১৭]

উল্লেখ্য যে, পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছ,

عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيِّ – رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.

আবু মাস'উদ আল-আনসারী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ স. কুকুরের বিক্রয়মূল্য ও পতিতার উপার্জিত সম্পদ গ্রহণ নিষেধ করেছেন।[১৮]

এ হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম।

তিন. অবৈধ গর্ভপাত

আল্লাহ তা'আলা নর ও নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ ও উভয়ের দাম্পত্য জীবনে যে আনন্দ দান করেছেন তা মহান আল্লাহর এক শ্রেষ্ঠ নি'আমত। সুতরাং যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ-আনন্দ উপভোগ করতে চায় কিন্তু এর ফলাফলকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না, সে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করার ইচ্ছা পোষণ করে।

অবৈধ গর্ভপাত পরিচিতি : গর্ভপাতের আভিধানিক অর্থ হলো অস্বাভাবিকভাবে ভ্রূণের গর্ভ থেকে নিঃসরণ বা ভ্রূণ হত্যা।[১৯] অস্বাভাবিকভাবে ব্যক্তি উদ্যোগে ও স্বেচ্ছায় গর্ভের ভ্রূণকে পরিপূর্ণ হওয়ার আগেই কোনো ঔষধ, আঘাত বা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নষ্ট বা হত্যা করাই হলো অবৈধ গর্ভপাত।

অবৈধ গর্ভপাত প্রতিরোধে ইসলামী আইন : আল্লাহ তা'আলা যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানববংশ বৃদ্ধির জন্য দান করেছেন সেগুলোকে সে আসল উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিছক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োগ করে। এমন ব্যক্তির উদাহরণ- ব্যক্তি শুধু বাসনা তৃপ্তির জন্য ভাল ভাল খাবার চিবিয়ে গিলে ফেলার পরিবর্তে বাইরে নিক্ষেপ করে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির মত এক ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ উপভোগ করে যদি মানব-বংশ বৃদ্ধির পথ বন্ধ করে, তাহলে সে নিজেরই ভবিষ্যৎ বংশকে হত্যা করে। এটা নিজ বংশ স্বহস্তে হত্যারই নামান্তর। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন :

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

---

১৭. আল-কুরআন, ৬ : ১৫১

১৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* বৈরূত : দারু ইব্‌ন কাছীর, ১৪০৭ হি., অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : কুকুরের বিক্রয়মূল্য, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৩২, হাদীস নং-২২৩৭

১৯. *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৩৪১

যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিলনা।[২০]

এ আয়াতে সন্তান হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বংশধররূপ আল্লাহর নি'য়ামতকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়াকে ক্ষতি বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষতির কতিপয় দিক হচ্ছে- জন্মনিরোধের প্রভাব পড়ে প্রথমত দেহ ও আত্মার উপর। কেননা, সন্তান জন্ম ও বংশ বৃদ্ধি সরাসরি দেহ ও আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত।

গর্ভপাত সম্পর্কে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি : চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জন্মনিরোধ উপকরণ ব্যবহারের ফলে জরায়ুর স্থানচ্যুতি (Falling of womb), শুক্রানু সংরক্ষণে অক্ষমতা এবং প্রায়শ মস্তিষ্ক বিকৃতি, হৃদকম্প ও উন্মাদরোগ পর্যন্ত দেখা দিয়ে থাকে। এছাড়া দীর্ঘকাল যাবৎ যে নারীর সন্তান জন্মায় না তার সন্তান ধারণোপযোগী অঙ্গে এক ধরনের শৈথিল্য ও পরিবর্তন দেখা দেয়, পরিবর্তীকালে সে গর্ভধারণ করলেও গর্ভ ও প্রসবকালে তাকে অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।[২১]

---

২০. আল-কুরআন, ৬ : ১৪০

২১. ডা. আর্নল্ড লুরান্ড, *Life Shortening Habits and Rajuvenation*. Filidelfia, p. 1922
জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যৌনবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ড. আসওয়াল্ড শোয়াজ মন্তব্য করেন : "এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ জৈবিক আইন যে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ তার প্রতি অর্পিত প্রাকৃতিক দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বদা উদগ্রীব। আর যদি তাদের এসব দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা হয়, তাহলে অনিবার্যরূপেই জটিলতা ও বিপদ দেখা দেবে। নারীদেহ গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মানোর জন্যই সৃষ্টি। যদি নারীকে তার ঐ দৈহিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রাখা হয়, তা হলে তার দেহ ও মনে নৈরাশ্য ও পরাজয়ের প্রভাব পড়তে বাধ্য। এ ছাড়া সন্তান প্রসবের দরুন তার দৈহিক যন্ত্রে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তার প্রতিকারই হচ্ছে মাতৃত্বের আস্বাদ ও সন্তান লাভজনিত মানসিক তৃপ্তি।"

-Dr. Oswald Schwaz, The Psychology of Sex, London : 1951, p. 17

বস্তুত জন্মনিরোধ যে নারীর প্রতি একটি নির্মম যুলুম এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ব্যবস্থা নিজের প্রকৃতির সঙ্গে তার বিবাদ বাধিয়ে দেয় এবং এর ফলে তার দেহ-মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সকল ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একদিকে জন্মনিরোধ ব্যবস্থাটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ এবং এর ক্ষতিও অপূরণীয়। তদুপরি জন্মনিরোধের জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করা হয় তা নর ও নারী উভয়ের, বিশেষত নারীদেহে ও মনে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, সমগ্র জীবন সে এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না বরং তার সমগ্র দৈহিক সত্তারই ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। জন্মনিরোধের সকল পন্থাই মানসিক জটিলতা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শুধু যে চিন্তার বিপর্যয় দেখা দেয় তাই নয়; বরং যৌনক্রিয়া থেকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে সুখানুভব করে থাকে সে আস্বাদটুকুও বিনষ্ট হয়ে যায়।

নারী পুরুষের বৈবাহিক জীবন এবং তদপরবর্তী সময়ে পরস্পরকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ রাখে সন্তান। সে সন্তানই যদি না থাকে তাহলে উভয়ের একত্রে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্যই ভোগবাদী সমাজে দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং জন্মনিরোধ আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। তাই আজ পাশ্চাত্য সমাজে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। জন্মনিরোধ ব্যবস্থা নর-নারীকে অবাধ যৌনাচারের লাইসেন্স দিয়ে দেয়। কেননা, এ প্রক্রিয়ার জারজ সন্তান জন্মের ফলে দুর্নাম রটনা ও সামাজিক লাঞ্ছনার ভয় থাকে না। এজন্য নারী-পুরুষ অবৈধ যৌনাচারের দিকে বেশি ধাবিত হয়। সমাজে বিবাহের হার কমে যায়। বিবাহ করে দায়িত্ব গ্রহণকে অনেকে বন্দিত্বের জীবন মনে করে, ফলে পারিবারিক প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্যের ন্যায় আমাদের মত ধর্মীয় ভাবাপন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এর কুফল পরিলক্ষিত হতে শুরু করেছে। ভোগ-লালসা ও আত্মপূজার মত চারিত্রিক রোগ দেখা দেয়। সন্তানহীন দম্পতির মধ্যে মানব-প্রজন্মের প্রতি দয়া-মায়া, ভালবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্যের মত মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। বরং কৃপণতা, হীনমন্যতা-স্বার্থান্ধতার প্রসার ঘটে। সমাজে বৈষম্যহার বেড়ে যায়। জন্মনিরোধের ফলে মা-বাবার এক/দুই সন্তান নীতির ফলে সন্তানের মধ্যে অনেক মানবীয় গুণাবলিও অর্জিত হয় না। অপরের সাথে মেলামেশা, ত্যাগ, সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে না। এভাবে এক/দুই সন্তান গ্রহণ নীতির ফলে ঐ বাবা-মার সন্তানকে উত্তম-নৈতিক শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত করা হয়।"[২২]

-Mlccormack, Arther, People, Space, Food, London, 1960, p. 74

২২. David M. Levy, Maternal Over Protection, Newyork, 1943. Arnold Green SA. Modern Introduction of Family, The Middle Class Male Child and Neurosis, London, 1961, p. 568

উল্লেখ্য যে, মানব-প্রজন্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর তা'আলা স্বাভাবিক বিধিতে পুরুষের কাজ হচ্ছে নারীর জরায়ুতে বীর্য পৌছে দেওয়া। এরপর মহান আল্লাহর অপার কৌশলে বিভিন্ন স্তর পার করে মানবসন্তান জন্মগ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় জানা যায়, পুরুষ যতবার নারীর সঙ্গে যৌনমিলনে প্রবৃত্ত হয় ততবারই তার দেহ থেকে নারীর দেহে ৩০ থেকে ৪০ কোটি পর্যন্ত শুক্রকীট প্রবেশ করে। প্রতিটি শুক্রকীটই নারীর ডিম্বকোষে প্রবেশের জন্য প্রতিযোগিতায় ধাবিত হয়। প্রতিটি শুক্রকীটেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব থাকে। এদের মধ্য থেকে বিশেষ গুণসম্পন্ন শুক্রকীট নিয়ে চাহিদা মাফিক মানব-শিশু জন্মানো মানব-ক্ষমতার বহির্ভূত। এক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর। কাজেই জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মানব জাতি অনেক প্রতিভাবান নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অধিক সংখ্যক জনশক্তিসম্পন্ন পরিবারই অধিকতর সাফল্য অর্জন করে। অপরদিকে জনশক্তির দিক দিয়ে ছোট পরিবারকে তুলনামূলকভাবে ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে দেখা গেছে।

-The Daily London Times, Too Small Families, 15 March 1969

তাছাড়া জন্মনিরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে যে জাতির জনসংখ্যা হ্রাস পায়, সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। মহামারী বা বড় ধরনের যুদ্ধে যদি বেশি লোক মারা পড়ে, তা হলে ঐ জাতি মানুষের অভাবে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতে বাধ সাধলে নানা বিপত্তি ঘটে। জন্মনিরোধের ফলে চীনে সম্প্রতি নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। জনমিতিক বিন্যাস ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ায় অনেক বিবাহযোগ্য যুবক সেখানে পাত্রী খুঁজে পাচ্ছে না। এর মূল কারণ হচ্ছে চীনের কঠোর জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন। ১৯৮০ সালে চীন এক সন্তান নীতি গ্রহণ করলে গণঅসন্তোষ দেখা দিলে ১৯৮৪ সালে আইনটিতে পরিবর্তন আনে। এতে আইনটি অতিমাত্রায় কন্যাবিরোধী হয়ে পড়ে। বেইজিংয়ের পিপল ইউনিভার্সিটির জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ এটিকে দেড় সন্তান নীতি বলে অভিহিত করেছেন।[২৩]

কাজেই কারও অধিকার নেই ভবিষ্যৎ বংশধর মানব প্রজন্মের জীবন বিনষ্ট করার। তা শিশুকে হত্যা করেই হোক কিংবা গোপনভাবে তার অস্তিত্ব সঞ্চারিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেই হোক। তবে জন্মনিরোধ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে গ্রহণ করার বৈধতার বিষয়ে ইসলামের আধুনিক পণ্ডিতগণ যে মতামত ব্যক্ত করেন তা নিম্নরূপ:

মা ও শিশুর-স্বাস্থ্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বৈধ বলে মুসলিম পণ্ডিতগণ অভিমত পোষণ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের মধ্যে রয়েছে ভিন্নমত। এ বিষয়ে সারকথা হচ্ছে-

১. কতক লোক জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সকল অবস্থায়ই পাপ বলে মনে করেন এবং স্বাস্থ্যগত কারণেও বৈধ মনে করেন না।
২. অনেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম যোগাড় করতে লজ্জাবোধ করেন। দোকানে যেয়ে কোন দীনদার লোকের পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম চাওয়াতে লজ্জাবোধ করা অস্বাভাবিক নয়।
৩. গর্ভসঞ্চার হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর নির্ভর করে বলে এ পদ্ধতি কেউ কেউ অর্থহীন মনে করেন।[২৪]

গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত, ভ্রূণ হত্যা কিংবা সদ্যপ্রসূত শিশু-সন্তান হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। জন্ম নিরোধ নারীর প্রতি একটি নির্মম যুলুম-এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এ ব্যবস্থা নিজের প্রকৃতির সঙ্গে তার বিবাদ বাধিয়ে দেয় এবং এর ফলে তার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সকল ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একদিকে জন্মনিরোধ ব্যবস্থাটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ এবং এর ক্ষতিও

---

২৩. এম এম ইসলাম, চীনা যুবকদের আশঙ্কা: বউ জুটবে তো-শীর্ষক প্রতিবেদন, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৬ জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ১১

২৪. সাইয়্যেদ আবুল 'আলা, *ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, পৃ : ৬৩-৬৪

অপূরণীয়। তদুপরি জন্মনিরোধের জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয় তা নর-নারীর উভয়ের বিশেষত নারীদেহে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, সমগ্র জীবন এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না; বরং তার সমগ্র দৈহিক সত্তারই ভিত্তি দুর্বল করে দেয়।

গর্ভপাত যে নারীর স্বাস্থ্য ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ব্যবস্থার জন্য ধ্বংসাত্মক- এ বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞই একমত। ডাঃ ফ্রেডিক টোমেগের মতে- "নারীর গর্ভকাল পূর্ণত্বে পৌঁছার পূর্বে যদি গর্ভস্থ ভ্রূণ স্থানচ্যুত (Abortion) করা হয় অর্থাৎ গর্ভপাত ঘটানো হয়, তা হলে মানববংশকে তিন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যথা :

প্রথমত. অজ্ঞাত সংখ্যক মানববংশকে পৃথিবীতে আসার আগেই হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয়ত. গর্ভপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভাবী মায়ের এক বিরাট সংখ্যা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

তৃতীয়ত. গর্ভপাতের ফলে বিপুলসংখ্যক নারীর দেহে এমন সব রোগের প্রভাব দেখা দেয়, যার ফলে ভবিষ্যৎ মানব-শিশু জন্মানোর সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।[২৫]

চার. অশ্লীল প্রকাশনা

সাধারণত 'প্রকাশ' বলতে কোন কিছুর প্রচার বা সঞ্চার বুঝায়। বাংলাদেশ কোড-এর, ২৮ নং আইন 'কপিরাইট আইন-২০০০'-এর আলোকে প্রকাশনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "প্রকাশনা" অর্থ কোন কর্মের অনুলিপি জনগণের নিকট সরবরাহ করার অথবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে প্রকাশনা অর্থে নিম্নবর্ণিত কার্য অন্তর্ভুক্ত হবে না। যথা

ক. নাট্যকর্ম, নাট্যসঙ্গীত, চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত কর্ম;

খ. জনসমক্ষে সাহিত্য কর্মের আবৃত্তি;

গ. তার, বেতার বা অন্য যে কোন মাধ্যমে যোগাযোগ, সাহিত্য বা শিল্পকর্মের সম্প্রচার;

ঘ. শিল্পকর্মের প্রদর্শনী;

ঙ. স্থাপত্য শিল্পের নির্মাণ।[২৬]

অশ্লীল প্রকাশনা প্রকাশ প্রতিরোধে ইসলামী আইন : ইসলামে মিডিয়ার মাধ্যমে অশ্লীলতা প্রচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর কেউ কোন খবর বললে

---

২৫. J.Taussing Fredrik, The Abrotion Problem: Procedinges of Conference of National Committee on Maternal Health, Baltimore, 1944, p. 39

২৬. *বাংলাদেশ কোড*, বাংলাদেশ কপিরাইট আইন-২০০০, ২৮ নং আইন, প্রথম অধ্যায়, ধারা নং-৩।

মু'মিনদেরকে তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করে গ্রহণ করার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾

হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।[২৭]

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দেয়ার মাধ্যমকে তথা মিডিয়ার মাধ্যমে সংবাদ গ্রহণের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পাপাচার তথা ফাসিকের বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সত্যতা যাচাই করে নেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। কারণ ফাসিক ব্যক্তি মিথ্যা কিংবা ভুল তথ্য পরিবেশন করতে পারে। এমতাবস্থায় তার কথার উপর ভিত্তি করে বিচার করলে বিচারকের সিদ্ধান্ত অবাস্তব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এ প্রকৃতির লোকেরা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে তৎপর থাকে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।[২৮]

পাঁচ. গীবত ও বুহতান (মিথ্যা অপবাদ)

অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারের অপর একটি মাধ্যম হলো গীবত তথা পরনিন্দা এবং বুহতান বা মিথ্যা অপবাদ।

গীবত ও বুহতান পরিচিতি : গীবত (غيبة) আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ-কুৎসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, পরোক্ষে নিন্দা ইত্যাদি।[২৯] কারো অগোচরে তার পোশাক–পরিচ্ছদ, বংশ, চরিত্র, দেহাকৃতি, কর্ম, দীন, চলাফেরা ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে কোন দোষ অপরের কাছে প্রকাশ করা।[৩০]

এ প্রসঙ্গে হাসান বসরী রহ. বলেন : পরচর্চায় তিন ধরণের পাপ হতে পারে। অপরের মধ্যে যে দোষ বিদ্যমান তা আলোচনা করা গীবত; যে ত্রুটি তার মধ্যে নেই তা আলোচনা করা অপবাদ; আর তার সম্বন্ধে যা কিছু শ্রুত তা আলোচনা করা মিথ্যা বলার শামিল।[৩১]

---

২৭. আল-কুরআন, ৪৯ : ৬
২৮. ইব্ন জারীর, প্রাগুক্ত, খ. ২৬, পৃ. ৭৭
২৯. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫২
৩০. আবূ হামেদ আল-গাযালী, *ইহয়িয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, বৈরূত : দারুল মা'রিফা,তাবি., খ. ৩, পৃ. ১৪৩
৩১. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৪

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায় :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغِيبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : গীবত হলো তোমার ভাই সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।[৩২]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

আবূ হুরায়রা রা. বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জান গীবত কী? সাহাবায়ে কিরাম বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : গীবত হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে। বলা হলো : যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা বিদ্যমান থাকে তাহলেও কি গীবত হবে? তিনি জবাবে বললেন : তোমার ভাইয়ের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান তা বললে তুমি তার গীবত করলে; আর তা না থাকলে তুমি তাকে বুহতান তথা মিথ্যা অপবাদ দিলে।[৩৩]

বুহতান (بهتان) আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ-অপবাদ, দুর্নাম, মিথ্যা, রটনা ইত্যাদি। ইসলামের চিরস্থায়ী বিধান হলো, কারো প্রশংসা করতে হলে তার অসাক্ষাতে আর সমালোচনা করতে হলে সাক্ষাতে করতে হয়। এ বিধান লংঘন করে যখনই কারো অসাক্ষাতে নিন্দা, সমালোচনা বা কুৎসা রটানো হয়, তখন তা শরীয়াত বিরোধী কাজে পরিণত হয়। এ ধরনের কাজ তিন রকমের হতে পারে এবং তিনটিই কবীরা গুনাহ। প্রথমত. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ বা দোষ আরোপ করা হয়, তা যদি মিথ্যা বা প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণহীন হয়, তবে তা নিছক অপবাদ। আরবীতে একে বুহতান বা কাযাফ বলা হয়।

গীবত ও বুহতান তথা মিথ্যা অপবাদ প্রতিরোধে ইসলামী আইন : ইসলামী বিধানে চোগলখোর ও পেছনে নিন্দাকারী এবং গীবতকারী সম্পর্কে কঠিন আযাবের ঘোষনা ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ইসলামী শরীয়াতে গীবত হারাম। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾

---

৩২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : গীবাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১৬১, হাদীস নং-৪৮৭৬

৩৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুল গীবাহ, খ. ১৬, পৃ. ১৪২, হাদীস নং-৬৭৫৮

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অনেক অনুমান বর্জন কর। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ। আর তোমরা কারও দোষ অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের গীবত কর না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? তোমরা তো অবশ্যই তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[৩৪]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

আনাস রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন : মি'রাজের রাত্রিতে আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে গমনের সময় দেখলাম তারা স্বীয় মুখমণ্ডল ও বুকের মাংস পিতল বা তামার নখ দ্বারা ছিন্ন করছে। আমি জিব্রাঈলের কাছে জানতে চাইলাম এরা কারা? তিনি বললেন : ওরা মানুষের মাংস ভক্ষণ করতো ও তাদের সম্মান হরণ করতো।[৩৫]

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

আবু বারযা আসলামী ও বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, তারা বলেন: রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন : হে মু'মিন সম্প্রদায়! যারা মুখে ঈমানের অঙ্গীকার করেছো; কিন্তু এখনো তা অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা মুসলমানদের অগোচরে তাদের নিন্দা করো না এবং তাদের দোষ অন্বেষণ করো না। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ অন্বেষণ করে আল্লাহ তা'আলা তার দোষ অন্বেষণ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা যার দোষ অন্বেষণ করেন তাকে স্বীয় গৃহে লাঞ্ছিত করেন।[৩৬]

গীবত করা সর্বসম্মতভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ। অনুরূপভাবে গীবত শ্রবণ করাও হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম। কারণ মানুষের চোখ, কান ও অন্তর সবকিছুকেই স্বীয়

---

৩৪. আল-কুরআন, ৪৯ : ১২

৩৫. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদব, পরিচ্ছেদ : গীবাহ, খ. ৫., পৃ. ১৯৪, হাদীস নং- ৪৮৪৭

৩৬. ইমাম আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আদব, খ. ৫, পৃ. ১৯৪-১৯৫, হাদীস নং-৪৮৮০; আলবানী, *সহীহুল জামে'*, খ. ২, পৃ. ১৩২২-১৩২৩, হাদীস নং-৭৯৮৪

কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৭]

মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. বলেন : ক্বিয়ামতের দিন কান, চোখ ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে। কানকে প্রশ্ন করা হবে : তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চোখকে প্রশ্ন করা হবে: তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? অন্তঃকরনকে প্রশ্ন করা হবে : তুমি সারা জীবন মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে; যেমন কারও গীবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চোখ দ্বারা শরীয়ত বিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন বেগানা স্ত্রীলোক বা সুশ্রী বালকের প্রতি কু-দৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারো সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আযাব ভোগ করতে হবে।[৩৮]

এছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মু'মিনগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾

তারা (মু'মিনরা) যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৩৯]

এখানে আয়াতটি বর্ণনামূলক হলেও তা দ্বারা মু'মিনদেরকে অনর্থক ও বাজে কথা শ্রবণ থেকে নিষেধ করার নির্দেশতুল্য। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ইরশাদ করেন:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾

এবং যারা অনর্থক কথাবার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বা নির্লিপ্ত থাকে।[৪০]

উল্লেখ্য যে, যে লোক কোন পুরুষ বা মেয়েলোককে যিনা বা পুংমৈথুনের মিথ্যা অপবাদ বা অভিযোগে অভিযুক্ত করবে, এ অভিযোগ রাষ্ট্র প্রধান-তথা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ের হবে, তাকে আশি দোররার শাস্তি দেয়া হবে। এভাবেই জনগণের মান মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইসলামে এ ব্যবস্থা থাকলে সমাজে

---

৩৭. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬

৩৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন*, অনুঃ মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃ. ৭৭

৩৯. আল-কুরআন, ২৮ : ৫৫

৪০. আল-কুরআন, ২৩ : ৩

এই পাপের ব্যাপক প্রচলন হত এবং তার ফলে বহু মানুষকেই নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হতো। তবে অভিযোগকারী যদি তার অভিযোগের সমর্থনে চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পেশ করতে পারে, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

আর যসব লোক সুরক্ষিত চরিত্রবান মেয়েলোকদের উপর যিনার অভিযোগ আনে, পরে সে জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো। তাদের সাক্ষ্য কখনই কবুল করবে না। ওরা ফাসিক। তবে যারা এ অপরাধ থেকে তওবা করবে ও নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ (তাদের জন্য) নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।[৪১]

---

৪১. আল-কুরআন, ২৪ : ৪-৫

প্রকাশ থাকে যে, অভিযোগকারী যদি স্বাধীন ও শরীয়াত পালনে বাধ্য হওয়ার উপযোগী হয় এবং অভিযোগটা হয় যিনা করার এবং তা মিথ্যা হয় বা প্রমাণিত না হয়-তাহলে উপরোক্ত শাস্তি তাদের উপর কার্যকর করা একান্তই কর্তব্য। আর অভিযোগ যদি যিনা বা পুংমৈথুন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে হয় (আর তা অপ্রমাণিত হয়) তাহলে তার উপর তাযীর ধার্য হবে। যিনার মিথ্যা অভিযোগ 'হদ্দ' ধার্য হচ্ছে, অথচ কাউকে কুফর বা মুনাফিকীর অভিযোগে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করা হলে তাতে হদ্দ ধার্য হয় না। এর মূলে কি তাৎপর্য নিহিত, এ নিয়ে লোকেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকে।

এ পর্যায়ে আমাদের জবাব স্পষ্ট। বস্তুত কারোর বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যা অভিযোগ তোলা অত্যন্ত মারাত্মক ধরণের অপরাধ, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এর পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া সমাজে খুব ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়। তাতে সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তি জনগণের আস্থা থেকে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে সমাজে যে ব্যাপক প্রচারণা চলতে থাকে তাকে মিথ্যা প্রমাণ করা ও তার খারাপ প্রতিক্রিয়া রোধ করা বা তার কু-প্রভাব মুছে ফেলা তার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। তাকে সারাটা জীবন মিথ্যা কলংকের বোঝা বহন করে অতিবাহিত করতে হয়। এ অবস্থা আরও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মেয়েলোক হয়। এই কলংক শুধু তাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে না, তার পিতৃপুরুষ ও তার গর্ভজাতদের মুখকে কালিমা লিপ্ত করে। আর অবিবাহিতা হলে তো তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়ার আশা প্রায়শেষ হয়ে যায়। কুফরীর মিথ্যা অভিযোগের তুলনায় যিনার মিথ্যা অভিযোগ অত্যন্ত ভয়াবহ, প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেক হালকা হয়ে থাকে। কেননা কারোর বিরুদ্ধে সেরূপ অভিযোগ উঠলেও তার বাস্তবে ইসলাম অনুসরণ ও শরীয়তের হুকুম আহকাম পালন তাকে জনগণের সম্মুখে মিথ্যা অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে অনেক সাহায্য করে। তাতে লজ্জার খুব একটা কারণ ঘটে না। কিন্তু যিনার মিথ্যা অভিযোগ এক একটি ব্যক্তির-সেই সাথে আর বহু ব্যক্তির জীবনকে চিরতরে কলঙ্কিত করে রাখে। অবশ্য এই শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে পাঁচটি শর্ত আর অপবাদ দাতার মধ্যে তিনটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে।

অপবাদমূলক লেখনী সাধারণভাবে বলা হয় এমন একটি লেখনী যা একজন ব্যক্তির কুৎসা রটনা করা এবং তাকে ঘৃণ্য ও ঘৃণার পাত্র বানায়। আর এটি তাকে মানুষের কাছে হাস্যকর ও ঠাট্টার পাত্র হিসেবে পরিগণিত করে।[৪২]

তবে অপবাদমূলক লেখনীর এ সংজ্ঞাটি টর্ট আইনের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ সংজ্ঞা নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে লর্ড এ্যাটবিল এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে : "অপবাদমূলক লেখনীর মাধ্যমে একজন ব্যক্তির সামাজিক অধিকারের ভিত্তিতে অনেক বাদীকে নীচু করে দেয়।" বহুল প্রচলিত এ সংজ্ঞাটি "Law of Criminal Libel" আইনের ধারা বলে গ্রহণ করা হয়েছে।[৪৩]

অপবাদমূলক লেখনীর প্রকাশনা আইন হলো লঘু অপরাধ। এ অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে "Defamatory Libel" আইন-১৮৪৩ এর দ্বারা ৬ মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।[৪৪]

যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে যে পাঁচটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে তা নিম্নরূপ :

(১) তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে;
(২) বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে;
(৩) মুসলিম হতে হবে;
(৪) স্বাধীন হতে হবে;
(৫) সচ্চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

অতএব, কোন শিশু, পাগল, অমুসলিম, পরাধীন এবং চরিত্রহীন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দেয়া হলে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবেনা, তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে। আর অপবাদদাতার মধ্যে যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে তা হল :

(১) অপবাদ দাতাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।
(২) বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।
(৩) স্বাধীন হতে হবে।

অতএব, অপবাদদাতা যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল হয়, তবে শরী'য়ী শাস্তি প্রযোজ্য হবে না এবং দাস-দাসী হলে অর্ধেক শাস্তি প্রযোজ্য হবে। তাই কাফিদেরকেও শাস্তি দেয়া হবে, এমনকি নারীকেও শাস্তি দেয়া হবে।

- ড. ওকাজ ফাকরী আহমাদ, *ফালসসাফাতুল 'উকূবাতু ফীশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ক্বানূন,* রিয়াদ! মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি., পৃ. ৫০

৪২. The Defamation Act 1952. ss 1 & 6, Goldsmuth v Pressdram Ltd (1977) QB 83 at 87, per Wien J., *Gleaves v Deakin (1980)* AC 477 at 487, (1979) 2 All ER 497 at 502, per Viscount Dilhorne

৪৩. Adams (1888) 22 QBD 66, CCR. Law Com Working Paper No 84, Para No. 38; The Defamation Act 1952. ss 1 & 6, Goldsmuth v Pressdram Ltd (1977) QB 83 at 87, per Wien J., *Gleaves v Deakin (1980)* AC 477 at 487, (1979) 2 All ER 497 at 502, per Viscount Dilhorne

৪৪. J.R. Spencer in *Reshaping the Criminal Law,* 285, quoted by Lord Edmund Davies, (1979) 2 All ER at 505; Cf Law Com Working

মিথ্যা অপবাদমূলক প্রকাশনা হলো, অপরাধ আইন ১৮৪৩ এর ধারা অনুযায়ী একটি লঘু অপরাধ। যেটার শাস্তি দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড। যদি এটি প্রমাণিত হয় যে, অপরাধী এটি জানতেন যে অপবাদটি মিথ্যা অথবা এটা যদি সত্যও হয়, তবে সাধারণ অপরাধ আইনে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং তার শাস্তি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বেশি হবে না।[৪৫]

ছয়. সমকামিতা

বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মরণ ব্যাধি এইডস, যার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। ১৯৮১ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা এ রোগের খবর পেলেন। বিজ্ঞানীরা এ রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন যে, এটি একটি বদমায়েশী রোগ, যা শুধু মাত্র দুশ্চরিত্রদেরকে আক্রমণ করে। ডাঃ রবার্ট রেডিফিল্ড বলেন, AIDS is a sexully transmitted disease. অর্থাৎ এইডস হচ্ছে যৌন অনাচার থেকে সৃষ্ট রোগ। রেডফিল্ড আরো বলেনঃ আমাদের সমাজের (মার্কিন সমাজের) অধিকাংশ নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই নেই। কম-বেশি আমরা সকলেই ইতর রতিঃপ্রবণ মানুষ হয়ে গেছি। এইডস হচ্ছে স্রষ্টার তরফ থেকে আমাদের উপর শাস্তি ও অন্যদের জন্য শিক্ষাও বটে। আমেরিকার প্রখ্যাত গবেষক চিকিৎসক ডনডেস সারলাইস বলেনঃ বিভিন্ন ধরনের পতিতা আর তাদের পুরুষ সঙ্গীরা এইডস রোগ সৃষ্টি, লালন পালন করে এবং ছড়ায়। ডাঃ জেমস চীন বলেন : দু'হাজার সালের আগেই শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ইতর রতিঃপ্রবণতা প্রাধান্য লাভ করবে। পেশাদার পতিতা ও সৌখিন পতিতাদের সংস্পর্শে যারা যায় এবং ড্রাগ গ্রহণ করে তারাই এইডস জীবাণু সৃষ্টি করে এবং তা ছড়ায়। এক কথায় অবাধ যৌনাচার, পতিতাদের সংস্পর্শ, সমকামিতার কু-অভ্যাস ও ড্রাগ গ্রহণকেই এইডসের জন্য দায়ী করা হয়।

Paper No 84, Paras No. 36 & 37; Foldsmith v Pressdram Ltd (1977) 2 All ER 557 9Wien J). Cf Desmind v Thorn (1982) 3 All ER 2868., (1983) 1 WLR 163 (Taylor J); Sir John Smith & Hogan, Criminal Law, Great Britain : The Bath Press, P. 737 এ আইন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, চিলি, প্যারাগুয়ে, ফ্রান্স, হংকং, হাঙ্গেরি, ইন্ডিয়া, আয়্যারল্যান্ড, ইটালি, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড ও ইউনাইটেড স্ট্যাট অব আমেরিকায় বলবৎ রয়েছে।

৪৫. Boaler v R (1888) 21 QBD 284. যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, চিলি, প্যারাগুয়ে, ফ্রান্স, হংকং, হাঙ্গেরি, ইন্ডিয়া, আয়্যারল্যান্ড, ইটালি, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড ও ইউনাইটেড স্ট্যাট অব আমেরিকায় এ আইনটি জারী আছে।

সম্প্রতি এ ভয়ংকর ব্যাধি আল্লাহর দেয়া বিধি নিষেধ অমান্যকারীদের উপর গযব হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾

তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যে যারা পাপী তাদেরকেও অতি সত্ত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।[৪৬]

---

৪৬. আল-কুরআন, ৩৯ : ৫১
এ রোগটির কারণে পূরো সমাজই সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত, অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে অবস্থান করছে। কি জানি কোন সময় এই এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়।
এ মরণব্যধির উৎপত্তি ঘটেছিল লূত আ.-এর সম্প্রদায়ের কুকর্মের জন্য। আর সেটি হলো লূত আঃ এর সম্প্রদায় ব্যভিচার করেছিল, মহিলা বাদ দিয়ে পুরুষে-পুরুষে। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.

"আমি লূতকে প্রেরণ করেছি, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল: তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা তো নারীদের ছেড়ে কামবশত পুরুষদের কাছে গমন কর। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। -আল-কুরআন, ৪২ : ৪৭
১৯৮৫ সালের অন্য এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে : ১৪,৭৩৯ জন এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ১০৬৫৩ জন রোগীই পুরুষ সমকামী। আমেরিকার মত উচ্চ শিক্ষিত সভ্য এবং সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হয়ে সমকামিতার মত নিকৃষ্ট ঘৃণিত মানবতা বিরোধী অশ্লীলতাকে যদি আইন করে বৈধ করে তাহলে কিভাবে সম্ভব অশ্লীলতাসহ মানব সভ্যতা ধ্বংসের সকল ধরণের কর্মকাণ্ডগুলো প্রতিরোধ প্রতিহত করে বিশ্ব সমাজে মানব সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা? কামপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে আবদ্ধ হয়ে লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্য বিসর্জন দিয়ে পার্লামেন্টে সমকামিতা বিল পাশ করে রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রকাশ্যে বৈধ ঘোষণা করেছে। ব্যভিচার যখন পার্লামেন্টে বৈধ ঘোষণা করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তা সমাজে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। আর তখনই সেই সমাজ আল্লাহর গজবের উপযুক্ত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতির বিরুদ্ধে নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয় যা হারাম ও গোনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। মানুষের পাশবিক ও লজ্জাকর অশোভন আচরণ যে কত দ্রুত সমাজ সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, আধুনিক শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তা সমস্ত বিশ্ববাসী আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ.

"যারা নিকৃষ্ট বস্তু অর্জন করেছে তার বদলাও সেই পরিমাণ নিকৃষ্ট এবং অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এমন কেউ নেই।" -আল-কুরআন, ১০ : ২৭

বিভিন্ন জটিল, দুরারোগ্য ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হল পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ এবং যাবতীয় বিধিনিষেধ যথাযথ ভাবে পালন। আর রাসূলে কারীম স.-এর মহান আর্দশের বাস্তবায়ন। বিশ্বের এই মহা দুর্যোগের সময় ইসলামের এই ধ্রুব সত্য ও হুশিয়ার বাণী উপলব্ধি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই WHO এ মর্মে ঘোষণা করেছে :

"এইডস প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় ধর্মীয় শিক্ষাদান এবং যথাযথ নির্মল আচরণ প্রবর্তনের চেয়ে আর কোন কিছুই অধিক সহায়ক হতে পারে না, যার প্রতি সকল ওহীভিত্তিক ধর্মে সমর্থন প্রদান ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।"[৪৭]

বিশ্বব্যাপী এ ব্যাধি শুরু থেকে ব্যাপক আকারে দেখা দেয়া পর্যন্ত প্রায় ১৩ মিলিয়ন নারী-পুরুষ ও শিশু এইচ.আই.ভি. তে আক্রান্ত হয়েছে যা এইডস রোগের কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন এবং এইডস রোগীর সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন হতে পারে। প্রতিদিন প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার লোক এইচ.আই.ভি.তে আক্রান্ত হচ্ছে।

আজ এইডস আতঙ্কে সমগ্র বিশ্ব প্রকম্পিত, সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, সারা বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এই ভয়াবহ মরণব্যধি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই মহামারী এইডস থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে এবং করছে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা সমূলে ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা বলছে, এইডস রোগের কোন চিকিৎসা নেই। কুরআনে বর্ণিত রয়েছে :

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ

"আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না।"- আল-কুর'আন, ৪২ : ৪৭

৪৭. Nothing can be more helpful in this preventive effort than religious teachings and the adoption of proper and decent behavior as advocated and urged by all divine religions, the role of Religion and ethics in the prevention and control of AIDS.
দিরোল অফ রিলিজিয়ন এন্ড ইথিক্স ইন দ্যা প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ এইডস, (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত), অনুচ্ছেদ-৯, পৃ. ৩ ।
ডাঃ মুহাম্মাদ মনসুর আলী বলেন : বর্তমান কালের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি এইচ. আই. ভি। এইডস এমনই এক সময়ে সমগ্র বিশ্বে চরম আতঙ্ক এবং নিরতিশয় হতাশা সৃষ্টি করেছে যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির অত্যুঙ্গ শিখরে অবস্থান করছে। এ মরণ ব্যাধির উৎপত্তি এবং বিস্তারের কারণ হিসাবে দেখা গেছে চরম অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি ও কুরুচিপূর্ণ সমকাম ও বহুগামিতার মত পশু সুলভ যৌন আচরণের উপস্থিতি। শতকরা প্রায় ৯৫% সমকামী এবং বহুগামী পুরুষ ও মহিলাদের মাধ্যমে এইডস সমগ্র বিশ্বে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং দিন দিন এইডস নামক মরণব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে।
-*আল উম্মাহ পত্রিকা*, রবিউল আখির, ১৪০৬ হিজরী

প্রচলিত আইনে অশ্লীলতার শাস্তি

আমাদের দেশের অধিকাংশ আইনই ব্রিটিশ আইনের উত্তরাধিকার। অশ্লীলতার আইনও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৭১৭ সালের আগে ইংল্যান্ডে অশ্লীলতার বিচার হত ধর্মীয় আদালতে। কোন বই অশ্লীল- সেটা ঠিক করতো ইংল্যান্ডের চার্চ। ১৭১৭ সাল থেকে স্থির হয় যে, অশ্লীলতার বিচার হবে সাধারণ আদালতে। ১৮৬৮ সালে হিকলিনস মামলায় অশ্লীলতার যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, মোটামুটি ভাবে তারই উপর ভিত্তি করে ভারতের অশ্লীলতা আইনগুলো রচিত। অশ্লীলতা নিরোধের জন্য বহু আইন ভারতে রয়েছে। এর প্রথম আইনটি হল ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ও ২৯৩ ধারা (Indian Penal Code, 1860, section 292 and ২৯৩)। এর উপর ভিত্তি করেই ১৯৮৭ সালে পাশ করা হয় নারীর অশোভন উপস্থাপন (নিরোধ) আইন (Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, ১৯৮৭)। এ ছাড়া, সিনেমাটোগ্রাফি আইন, ১৯৫২ (Cinematography Act ১৯৫২), ইনফরমেশন টেকনোলোজি আইন, ২০০০ (Information Technology Act, ২০০০) ও অন্যান্য মিডিয়া বিষয়ক আইনেও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অবস্থান আছে। যেমন : ১৮৬০ সালের ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধার-এ: উল্লেখ আছে :

"কোনো অশ্লীল বই, পুস্তিকা, কাগজ, অঙ্কন, ছবি, মূর্তি বা অন্য কোনো অশ্লীল জিনিস বিক্রি, ভাড়া দেয়া, প্রদর্শন বা বিতরণ করার উদ্দেশ্যে বানানো; অথবা উপরোক্ত অশ্লীল জিনিসগুলো বিক্রি, ভাড়া দেয়া, বিতরণ বা প্রদর্শন করা, অথবা সেগুলি নিজের কাছে রাখা হল দণ্ডনীয় অপরাধ।"

উপরোক্ত যে কোনো উদ্দেশ্যে কোনো অশ্লীল বস্তু আমদানী বা রপ্তানী করা; নিজের সে উদ্দেশ্য না থাকলেও সেই উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহৃত হতে পারে যদি জানা থাকে - সেটাও দণ্ডনীয় অপরাধ। নিজের জ্ঞাতসারে অশ্লীল বস্তু সংক্রান্ত ব্যবসায় অংশ নিলে বা সেই ব্যবসার লভ্যাংশ গ্রহণ করলে - সেটিও হবে দণ্ডনীয়। এই ধারা অনুসারে অবৈধ কোনো কাজে যুক্ত লোকের খবর কাউকে জানালে বা তার জন্য বিজ্ঞাপন দিলে-সেটাও অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

এই সব অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান হচ্ছে প্রথম অপরাধে ২ বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের জন্য কারাবাসের সময় ৫ বছর পর্যন্ত এবং জরিমানার পরিমাণ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত।

তবে এর কিছু ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমগুলো হল:

কোনো বই, কাগজ, লেখা, আঁকা, ছবি, বর্ণনা বা মূর্তির ক্ষেত্রে - সেগুলো যদি সাধারণের মঙ্গলের জন্য হয়, যেমন বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প বা শিক্ষার প্রয়োজনে বা কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে - তাহলে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

স্থাপত্য, চিত্র বা অন্য কোনো বর্ণনা যদি কোনো প্রাচীন স্মৃতিসৌধতে থাকে (এনশেন্ট মনুমেন্ট এন্ড অর্কিওলজিক্যাল সাইটস এন্ড রিমেইন্স অ্যাক্ট. ১৯৫৮ অনুসারে) বা কোনো মন্দিরে থাকে অথবা এগুলো ধর্মীয় কারণে রাখা হয়। সেক্ষেত্রে সেগুলি এই ধারার আওতায় পড়বে না।[৪৮]

পেনাল কোডের ২৯৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি পূর্বোল্লিখিত অশ্লীল বস্তু ২০ বছরের কম বয়সী কারো নিকট বিক্রি করা হয়, ভাড়া দেয়া হয়, প্রদর্শন করা হয় বা বিতরণ করা হয়, তাহলে শাস্তির পরিমাণ বেড়ে প্রথম অপরাধের জন্য কারাবাস ৩ বছর পর্যন্ত ও জরিমানার পরিমাণ ২ হাজার টাকা পর্যন্ত হবে। দ্বিতীয় বা পরের অপরাধের জন্য কারাবাস ৭ বছর পর্যন্ত এবং জরিমানার পরিমাণ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত হবে। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ সালের এক সংশোধনীতে শাস্তির পরিমাণ আরও বাড়ানো হয়েছে।[৪৯]

ইন্টারনেটে প্রচারিত অশ্লীলতা রোধ করার জন্য ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যাক্টের ৬৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, ইলেকট্রনিক উপায়ে যদি কোনো বস্তু পাঠানো হয় যা লাম্পট্যজনক বা যা কামপ্রবৃত্তিকে আকৃষ্ট করে, অথবা যার ফল, যদি সামগ্রিক ভাবে বিচার করা যায়, লোকের মনকে কলুষিত (deprave) ও নৈতিক ভাবে অধঃপতিত (corrupt) করতে পারে-সেটি হবে দণ্ডনীয় অপরাধ। প্রথম অপরাধের জন্য ৫ বছর পর্যন্ত কারাবাস ও ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা; পরবর্তী অপরাধের জন্য ১০ বছর পর্যন্ত কারাবাস ও ২ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।[৫০]

নারীর অশোভন উপস্থাপন (নিরোধ) আইনে নারীর অশালীন উপস্থাপনার অর্থ বলা হয়েছে নারীর শরীরকে - তার আকার, দেহ বা দেহাংশকে এমন ভাবে দেখানো যেটি অশালীন, নারীদের প্রতি অপমানসূচক বা নারীকে ছোট করা হচ্ছে, অথবা যা মানুষের নীতিবোধকে দূষিত, অধঃপতিত বা আহত করবে।[৫১]

এই আইনে বলা হয়েছে কোনো বিজ্ঞাপনে নারীদের অশালীনভাবে দেখানো চলবে না। এখানে বিজ্ঞাপন বলতে ধরা হয়েছে যে কোনো বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার, মোড়ক বা অন্য কোনো কাগজপত্র। এগুলো ছাড়া আলো, শব্দ, ধোঁয়া বা গ্যাসের মাধ্যমে কোনো দর্শনযোগ্য উপস্থাপনাও এই আওতায় পড়বে।[৫২]

---

৪৮. ১৮৬০ সালের ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধারা ।

৪৯. ১৮৬০ সালের ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯৩ ধারা ।

৫০. প্রাগুক্ত

৫১. প্রাগুক্ত

৫২. প্রাগুক্ত

এছাড়া কোনো বই, পুস্তিকা, কাগজ, ফিল্ম, স্লাইড, লেখা, আঁকা, চিত্র, ফটোগ্রাফ, বা কোনো আকৃতি যাতে নারীকে অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তার প্রকাশনা করা, বিক্রি করা, বিতরণ করা চলবে না। তবে এ ব্যাপারে কতগুলো ব্যতিক্রম আছে। যেমন, এগুলো যদি বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প-চর্চা বা শিক্ষা-চর্চায় সহায়তা করে- তাহলে এতে অন্যায় হবে না। পেনাল কোডের ২৯২ ধারার মত এখানেও বলা হয়েছে যে, ধর্মীয় কারণে - মন্দিরে, পুরনো মনুমেন্টের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না।[৫৩]

অনলাইনে অসত্য ও অশ্লীল কিছু প্রকাশে ১৪ বছরের কারাদণ্ড

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি আইনের অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংশোধিত তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি আইন লঘুপাপে গুরুদণ্ডের শামিল বলে প্রমাণিত। অনলাইনে অসত্য ও অশ্লীল কিছু প্রকাশের কারণে যদি ১৪ বছরের কারাদণ্ড হয়, তবে খুনের শাস্তি কত বছর হবে, এমন প্রশ্নও ওঠেছে। এ সম্পর্কে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি) আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এই মত দেন। আলোচনায় বক্তারা তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বাতিলের দাবি জানান। এ ধারায় বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে মিথ্যা ও অশ্লীল কিছু প্রকাশ করলে, যা দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যের মানহানি ঘটায়, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়, ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে বা কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি দেয় তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোনো ব্যক্তি এ ধরনের অপরাধ করলে তিনি সর্বোচ্চ ১৪ বছরের ও সর্বনিম্ন সাত বছরের কারাদণ্ডে এবং সর্বোচ্চ এক কোটি টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।' আগের আইনে কারাদণ্ডের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ১০ বছর। গত ২০ আগস্ট অধ্যাদেশের মাধ্যমে এ আইন সংশোধন করে শাস্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি হামিদা হোসেন বলেন, আইন করা হয় নাগরিকের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু এই আইনটি স্বাধীনতা হরণ করার জন্য। আইন বিশ্লেষক শাহদীন মালিক বলেন, আগামী বছর টিআইবি দুর্নীতির যে প্রতিবেদন প্রকাশ করবে, সেখানে যদি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, তবে এই আইন বলে টিআইবির কর্মকর্তাদের অন্তত সাত বছর করে জেল হবে। এ আইন থাকা মানে দেশকে অসভ্য বা মধ্যযুগে ঠেলে দেয়া। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, জনগণ রাষ্ট্রের মালিক। কিন্তু এই আইনের মাধ্যমে জনগণকে ত্রাসের রাজত্বে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে বিরোধী দলের

---

৫৩. প্রাগুক্ত

আপত্তি নেই। সম্ভবত তারা বিয়য়টি উপভোগ করছে। ক্ষমতায় গিয়ে তারা আইনটির অপপ্রয়োগ করবে। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) পরিচালক সারা হোসেন বলেন, আইনের সংজ্ঞা সুস্পষ্ট হতে হবে। যাতে মানুষ বুঝতে পারে, সে যা লিখছে তা বেআইনি কি না। কিন্তু বর্তমান আইনটি অস্পষ্ট। সরকার ইচ্ছামতো এর অপপ্রয়োগ করতে পারবে। তাই এখন ইন্টারনেটে কিছু লেখার আগেই ভাবতে হবে। এ লেখার কারণে সাত বছরের, নাকি ১৪ বছরের জেল হবে। আইআইডির নির্বাহী প্রধান সাঈদ আহমদে বলেন, এই আইনের মাধ্যমে লঘুপাপে গুরুদণ্ডের বিধান চালু করা হয়েছে। আইনটি তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, আইনটি অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে এর অপপ্রয়োগ হবে।[৫৪]

অশ্লীলতা মানবজীবনের জন্য এমন ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক ভাইরাসের ন্যায়; যা প্রতিটি মানুষকে ক্রমান্বয়ে তার দৈহিক, মানসিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আঘাত করে তাকে দুর্বল করে দেয়। আর তার সুন্দর ও সাবলীল এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করে থাকে। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, যে সকল বিষয় মানুষের প্রতিটি স্তরে ক্ষতি করে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় আধুনিক প্রজন্মের সেদিকেই চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলছে। আর তা হবে না কেন? নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিলেই তো নৈতিকতা নিঃশেষ করা অনায়াসে সম্ভব হবে। আর সে জন্য বেছে নেয়া হয়েছে আধুনিক গণমাধ্যমসমূহ। নিম্নে এ অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারের আধুনিক গণমাধ্যমসমূহের বৈরী পদক্ষেপ সম্পর্কে চিত্র তুলে ধরা হলো :

ক. **ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সুপারস্টার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতা :** বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সুপারস্টার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আর তাতে অংশ নেয় বিভিন্ন সুন্দরীগণ। আর সেখানে সুপারস্টার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে প্রদর্শিত হয় তাদের উলঙ্গ দেহের বিভিন্ন অংগের বৈচিত্রময় ব্যবহার। যা সেখানে উপস্থিত ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরিচালিত চ্যানেলগুলোর দর্শকদের নৈতিক জীবনকে যৌন সুড়সুড়ির দিকে ধাবিত করে। তন্মধ্যে বিভন্ন রাষ্ট্রের সুন্দরী মিস, মিস ওয়ার্ল্ড ও বিভিন্ন পুরস্কার দেয়ার অনুষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য। তবে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির এ কালো ছোবলে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। যা মুসলিম জাতির জন্য একটি অশুভ লক্ষণ।

---

৫৪. www.prioy.com/2013/09/07

খ. **ইউটিউবে আপলোড করা বিভিন্ন নগ্ন ভিডিও :** অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারে আধুনিক প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভিডিও আপলোড ও ডাউনলোড করার উল্লেখযোগ্য একটি ওয়েবসাইট হলো 'ইউটিউব'। যেখানে একজন ব্যক্তি যে কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারে। এ বিষয়টিকে আমরা সকলেই ইচ্ছা করলে ভালো ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু তা না করে বরং সেখানে এমন এমন ভিডিও আপলোড করা হয় যা ইতঃপূর্বের সকল নগ্নতাকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কেননা সেখানে সকল প্রকার নগ্ন ভিডিও প্রকাশ করা হয়। যেমন : কোনো ছেলে-মেয়ের অন্তরঙ্গ ভিডিও, গোপনে ধারণকৃত অশ্লীল দৃশ্য ইত্যাদি।

গ. **ফেসবুক :** আধুনিক যোগাযোগ ও গণমাধ্যমের একটি বহুল চর্চিত মাধ্যম হলো ফেসবুক। যার মাধ্যমে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও বার্তা আদান-প্রদান করা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে এ গণমাধ্যমে এমন কিছু অশ্লীল ছবি দিয়ে আইডি খোলা এবং সেখানে এমন অশ্লীল ছবি ও মন্তব্য পোস্ট করা হয় যা ইসলামী শরী'আত ও নৈতিকতা বিরোধী। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা না হলে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ও আগত প্রজন্ম নৈতিকতা থেকে দূরে চলে যাবে এবং জাতি মেধা-বুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে।

ঘ. **বিভিন্ন ব্লগ :** যোগাযোগ মাধ্যমের একটি বৃহৎ মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। এ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি বিভিন্ন নামে ব্লগ তৈরি করেন। আর সেখানে তারা নিজস্ব মতামত ও নানাবিধ লেখা পোস্ট করে থাকেন। কিন্তু আধুনিককালে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নামে ব্লগ পরিচালিত করে থাকেন, যেখানে ইসলাম বিরোধী ও যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য বিভিন্ন নাস্তিক্যবাদী, জঙ্গিবাদী এবং উস্কানিমূলক লেখা পোস্ট করে থাকেন। আর এ কারণে আজ আমাদের যুবসমাজের মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিকতাবোধ পরিলক্ষিত হয় না। আর এগুলো পড়ে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা জন্ম নিতে শুরু করেছে। আর তারই প্রভাব পড়ছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর।

ঙ. **বিভিন্ন পত্রিকা :** বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৈনিক, পাক্ষিক, দ্বি-পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকায়, অশ্লীল ও নগ্ন ছবি পরিলক্ষিত হয়। এ সকল পত্রিকার মধ্যে আবার এমন পত্রিকাও রয়েছে যেগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তমূলক বক্তব্য ও ছবি প্রকাশ করা হয়। অত্যন্ত পরিতাপ ও দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের দেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বাংলাদেশে বিজাতীয়দের অনুসরণ করে একই বক্তব্য প্রচার করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকার এমন কিছু নির্দিষ্ট পাতা রয়েছে যেখানে, অর্ধনগ্ন ও নগ্ন ছবি প্রকাশিত হয়। আর এ সকল পত্রিকার পাতাগুলোতে অশ্লীল ছবি প্রকাশিত

হওয়ার কারণে সর্বস্তরের জনগণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আর এ জন্য সমাজেও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া আরো কিছু পত্রিকা বাজারে পাওয়া যায় যা গোপনে বিক্রি করা হয় এবং তার মূলবিষয় হলো নগ্নতা ও যৌনতাকে উস্কিয়ে দেয়া।

চ. **নগ্ন বিলবোর্ড ও পোস্টার :** অশ্লীলতার অপর একটি প্রচার মাধ্যম হলো নগ্ন বিলবোর্ড ও অশ্লীল পোস্টার। এ দৃশ্যটি বাংলাদেশে অনেক বছর আগে থেকেই প্রচলিত। যদিও পূর্ব থেকেই এটি প্রচলিত কিন্তু বর্তমানে যে অশ্লীল পোস্টার দেখা যায় তা হয়তো পূর্বের সকল কার্যক্রমকেও হার মানিয়ে দেবে। কেননা অধুনা সিনেমার পোস্টারগুলোতে এমন কিছু উলঙ্গ নারীদের ছবি প্রকাশ করা হয়, যার দিকে কোনো নারীও হয়তো দৃষ্টিপাত করতে পারে না। লজ্জায় তার মাথা নত হয়ে যাবে। আর এগুলো যখন যুব সমাজের মাঝে প্রকাশিত হয় তখন তারা এ সকল পোস্টার দেখে বিভিন্ন রকম অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে।

ছ. **নারীদের বেপর্দাভাবে চলাচল :** এ বিষয়ে লিখলে একটি গ্রন্থই লেখা যায়। যেহেতু এটি একটি প্রবন্ধ, তাই এখানে মৌলিক কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো। নারী জাতির জন্য পর্দা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে একটি আবশ্যিক বিধান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে ঢেকে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীন যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৫৫]

---

৫৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১

ইসলাম নারীদেরকে ঘরে বসে থাকতে বলেনি। তবে যখন সে বের হবে তখন তাকে কিছু নির্দেশনা মেনে তারপর বের হওয়ার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। যেমন : কারুকার্য ও নকশা বিহীন হিজাব ব্যবহার করা[৫৬], পর্দা সুগন্ধি বিহীন হওয়া[৫৭], শীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেসে উঠে এমন পাতলা ও সংকীর্ণ হিজাব না হওয়া, পর্দা শরীরের রং প্রকাশ করে দেয় এমন পাতলা না হওয়া, নারীর পর্দা পুরুষের পোশাকের ন্যায় না হওয়া, সুখ্যাতির জন্য হিজাব পরিধান না করা[৫৮], পর্দা

অন্যত্র এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

"হে নবি, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে , কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" - আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৯

৫৬. তার প্রমাণ পূর্বে বর্ণিত সূরা নুরের আয়াত- وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ "তারা স্বীয় রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।" এ আয়াতের ভেতর কারুকার্য খচিত পর্দাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা যে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে বারণ করেছেন, সে সৌন্দর্যকে আরেকটি সৌন্দর্য দ্বারা আবৃত করাও নিষেধের আওতায় আসে। তদ্রূপ সে সকল নকশাও নিষিদ্ধ, যা পর্দার বিভিন্ন জায়গায় অঙ্কিত থাকে বা নারীরা মাথার উপর আলাদাভাবে বা শরীরের কোন জায়গায় যুক্ত করে রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
"আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।" -আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৩।

التبرج অর্থ: নারীর এমন সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য প্রকাশ করা, যা পুরুষের যৌন উত্তেজনা ও সুড়সুড়ি সৃষ্টি করে। এরূপ অশ্লীলতা প্রদর্শন করা কবিরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : "তিনজন মানুষ সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর না। (অর্থাৎ তারা সবাই ধ্বংস হবে।) যথা : ক. যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে গেল অথবা যে কুরআন অনুযায়ী দেশ পরিচালনকারী শাসকের আনুগত্য ত্যাগ করল, আর সে এ অবস্থায় মারা গেল। খ. যে গোলাম বা দাসী নিজ মনিব থেকে পলায়ন করল এবং এ অবস্থায় সে মারা গেল। গ. যে নারী প্রয়োজন ছাড়া রূপচর্চা করে স্বামীর অবর্তমানে বাইরে বের হল।"
- হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৫৮

৫৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুগন্ধি ব্যবহার করে নারীদের বাইরে বের হওয়া হারাম। সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ, রাসূলের একটি হাদীস উল্লেখ করছি, তিনি বলেন : "যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বের হল, অতঃপর কোন জনসমাবেশ দিয়ে অতিক্রম করল তাদের ঘ্রাণে মোহিত করার জন্য, সে নারী ব্যভিচারিণী।" -ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৭০১

৫৮. সুখ্যাতির জন্য হিজাব পরিধান না করা বা মানুষ যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, পর্দা এমন কাপড়ের না হওয়া। সুনাম সুখ্যাতির কাপড়, অর্থাৎ যে কাপড় পরিধান করার দ্বারা মানুষের

বিজাতীয়দের পোশাক সদৃশ্য না হওয়া[৫৯] ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক নারীরা এ সকল নির্দেশনার কোনোটাই মানছেন না। আর যে কারণে আজ তারা ধর্ষিত, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছেন। আর সে কারণে দায়ী করা হয় পুরুষদেরকে।

মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ উদ্দেশ্য হয়। যেমন উৎকৃষ্ট ও দামি কাপড়। যা সাধারণত দুনিয়ার সুখ-ভোগ ও চাকচিক্যে গর্বিত-অহংকারী ব্যক্তিরাই পরিধান করে। এ হুকুম নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে কেউ এ ধরনের কাপড় অসৎ উদ্দেশ্যে পরিধান করবে, কঠোর হুমকির সম্মুখীন হবে, যদি তওবা না করে মারা যায়।

৫৯. এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"ইব্‌ন উমার রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখল, সে ওই সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে গণ্য।" -ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৬০, হাদীস নং-৫২৩২

এ প্রসঙ্গ মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ.

"যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাজিল হয়েছে, তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি? আর তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে ইতঃপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল।" -আল-কুর'আন, ৫৭ : ১৬।

ইবনে কাছীর অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন : "এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে মৌলিক কিংবা আনুষঙ্গিক যে কোন বিষয়ে তাদের সাদৃশ্য পরিহার করতে বলেছেন। ইবনে তাইমিয়্যাও অনুরূপ বলেছেন। অর্থাৎ অত্র আয়াতে নিষেধাজ্ঞার পরিধি ব্যাপক ও সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কাফেরদের অনুসরণ করা যাবে না।" -ইব্‌ন কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৮৪

এ প্রসঙ্গে নারীকে সতর্ক করার ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الصَّلَاةَ يَوْمَ العِيْدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتْ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءَ الخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيْرَ، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِيْنَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল সা.-এর সাথে একবার ঈদের জামাতে অংশ গ্রহণ করলাম। আজান-একামত ব্যতীত তিনি খুতবার পূর্বেই সালাত আরম্ভ করলেন। সালাত শেষে বেলাল রা.-এর কাঁধে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। সকলকে আল্লাহর তাকওয়ার আদেশ দিলেন, তার আনুগত্যের উৎসাহ প্রদান করলেন। মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করলেন। অতঃপর নারীদের নিকট গমন করে তাদের উদ্দেশ্যে নসিহত করে বললেন : তোমরা সদকা কর, তোমাদের অধিকাংশই হবে জাহান্নামের ইন্ধন। বিবর্ণ-ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল নিয়ে নারীদের মধ্য হতে একজন দাঁড়িয়ে বলল : কেন, হে আল্লাহর রাসূল? রাসূল বললেন, কারণ

ট. মোবাইলের মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে : আধুনিক যুগে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল অন্যতম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হচ্ছে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। যেমন ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ধারণ করে ব্লুটুথের মাধ্যমে পরস্পর ফাইল আদান-প্রদান করা, বিভিন্ন অশ্লীল ভিডিও মেমোরি কার্ডে ধারণ করে তা দেখা। আর এর মাধ্যমে আমাদের সমাজ বিশেষ করে যুব সমাজ একেবারে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর কারণে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে বড় ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে আর যে কারণে আজ জাতি ধ্বংস হতে বসেছে। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই জাতীয় সম্প্রচার নীতি প্রণয়ন করেছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে সম্প্রচার মাধ্যমের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা, বিনোদনের জন্য সুস্থ ধারার নাটক, চলচ্চিত্র, গান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। শিশু বা নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্যমূলক আচরণ বা হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে এমন অনুষ্ঠান প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে, শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক, মানবিক এবং নৈতিক গঠনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন ধরনের অশ্লীল, তথ্যগতভাবে ভুল ও ভাষাগতভাবে অশোভন এবং সহিংসতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ সকল নীতিমালা থাকলেও তার যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরী। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখা জরুরি তাহলো : জাতীয় নীতিমালা অনুসরণের পাশাপাশি অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসার থেকে মুক্তি পাবার জন্য ধর্মীয় আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগিয়ে অবাধ অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার মধ্যেই রয়েছে প্রতিবিধান। চরিত্রের উত্তম গুণাবলো দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে এ সকল অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসার প্রতিরোধ করা বর্তমান সময়ের গণদাবী প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর বাণী ও রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসের প্রতিধ্বনি মাত্র। কারণ, যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথগামী। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত, কুরআন, সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকামী হওয়া এবং সে সম্পর্কে যথেষ্ট আমল করে নিজেদের আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা।

তোমরা অধিক অভিযোগ কর, স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও। জাবির বলেন : অতঃপর তারা তাদের অলংকারাদি সদকা করতে আরম্ভ করল। তাদের কানের দুল ও আংটি বেলালের বিছানো কাপড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। -ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* পরিচ্ছেদ : সালাতুল 'ঈদাইন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৫৩, হাদীস নং-২০৮৫

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ*

[**সারসংক্ষেপ :** *এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সে উদ্দেশ্য সাধন এবং মানুষের সুষ্ঠু, সুন্দর ও পরিমার্জিত জীবন পরিচালনার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে উন্নততর জীবন দর্শন হিসেবে মানুষকে দেয়া হয়েছে ইসলামী শরী'আহ্। এ শরী'আহ্র মৌলিক ও চিরন্তন লক্ষ্য-উদ্দেশের অন্যতম হলো, পাঁচটি জরুরী বিষয় সংরক্ষণ করা। মানব সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সকল ধরনের ক্ষতি ও সংকীর্ণতা দূর করা, জীবনকে সহজ ও সুন্দর করা ইত্যাদি শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করত ইহকাল ও পরকালে তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। অতএব বলা যায়, শরী'আহ্র উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসীকে যথেচ্ছাচার, ভুলভ্রান্তি ও কামনা-লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসা, যাতে করে পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠু পন্থায় কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা যায়। মানব জীবনে অর্থ-সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। পুরুষের ন্যায় নারীও শরী'আহ নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদের হকদার হয়ে থাকে। এ সম্পদের অংশ কোন মানুষের পক্ষে কম বা বেশি করা সম্ভব নয়। নারীর জন্য যে ধরনের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা'আলা সে ধরনের অংশই তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। কোথাও পুরুষের জন্য বেশি, আবার কোথাও নারীর জন্য বেশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে ঠকানো হয়েছে, আবার কোন ক্ষেত্রে নারীকে ঠকানো হয়েছে। কারণ নারী-পুরুষ উভয়ই আল্লাহ্র সৃষ্টি। উভয়ের জন্য যা কল্যাণকর আল্লাহ্ তা'আলা তাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে একটি শ্রেণী আল্লাহ্ নির্ধারিত এ বিধানকে অস্বীকার করে নারীর উত্তরাধিকার হিস্যাকে বৈষম্যমূলক উল্লেখ করে কোমলমতি-সহজ-সরল নারীদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এতদ্‌বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা তুলে ধরে তাদের এ সংক্রান্ত ভ্রান্তি অপসারণের চেষ্টা করা হয়েছে।]*

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ।

নারীর উত্তরাধিকার

জাহিলী যুগে মেয়েরা যদি নিজেরাই কোন উপায়ে কিছু সম্পদ উপার্জন করত অথবা কারো নিকট থেকে উপহার বা উপঢৌকন হিসেবে কোন কিছু পেত, তাতে তাদের কোন অধিকার থাকতো না। তারা পিতা মাতার কোন সম্পদ লাভ করলেও তাতে তাদের কোন অধিকার বলবৎ করার উপায় ছিল না। তাদের পুরুষ অভিভাবকরাই এ সম্পদের মালিক হয়ে বসত এবং তাদের ইচ্ছে মত মেয়েদের সম্পদ ব্যয়-ব্যবহার করত। কিন্তু ইসলাম মেয়েদেরকে তাদের উপার্জিত, উত্তরাধিকার কিংবা বৈধ কোন উপায়ে প্রাপ্ত ধন-সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ অধিকার দান করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾

পুরুষরা যা উপার্জন করে তাতে তাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর নারীরা যা উপার্জন করে তাতেও রয়েছে তাদের পূর্ণ অধিকার।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির জারুল্লাহ আয-যামাখ্শারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) রহ. বলেন :

جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من حاله الموجبة للبسط أو القبض كسبا له

পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের অবস্থা কিসে ভালো হবে এবং কিসে খারাপ হবে- এতদসংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী সম্পদের মধ্যে নারী-পুরুষ প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশকে তাদের নিজেদের উপার্জন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।[২]

অতএব, ইসলামী শরী'আতে নারীদের অর্জিত বা প্রাপ্ত সম্পদে তাদের পরিপূর্ণ অধিকার স্বীকৃত। এতে তাদের কোন অভিভাবক বা অপর কারো হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই।

ইসলামপূর্ব যুগে মৃত আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদে মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ইসলাম পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের অধিকারও নির্ধারিত করে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ﴾

---

১. আল-কুরআন, ৪ : ৩২

২. আবুল কাসিম জারুল্লাহ্ আয-যামাখশারী, *তাফসীরে কাশ্শাফ*, বৈরুত : দারুল মা'রিফাত, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৯৫

> পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে আমি প্রত্যেকের জন্যই উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি।[৩]

শাইখ তানতাবী জাওহারী (১৮৭০-১৯৪০ খ্রি.) এ আয়াতের শাব্দিক ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন: "(প্রত্যেক) পুরুষ এবং নারীর জন্য (আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি)। তারা চাচার সন্তান অথবা ভাই অথবা অন্যান্য আত্মীয়বর্গ। (পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যা রেখে যায়) তারা তাদের পরিত্যক্ত সেসব সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে।"[৪]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লেখিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীই অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ের সামগ্রিকতা বোঝাতে জন্য আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন,

> ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾
>
> পিতা-মাতা ও নিকটতর আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটতর আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হোক বা বেশি হোক, এ অংশ নির্ধারিত।[৫]

এ আয়াতের ব্যাখায় মাওলানা আব্দুল হক হাক্কানী রহ. বলেন : "এখানে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা হোক অথবা অন্য কোন আত্মীয় হোক, তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের যেমন অংশ আছে, ঠিক তেমনি মহিলাদেরও অংশ রয়েছে। এ সম্পত্তির পরিমাণ কম হোক আর বেশি হোক।"[৬]

অতএব, নারীর উত্তরাধিকার হিস্যা বা অংশীদারিত্ব সামগ্রিক ও নির্ধারিত, এতে কোন পরিবর্তনের ক্ষমতা ও এখতিয়ার কারো নেই।

নারীর সামগ্রিক উত্তরাধিকার অংশীদারিত্বে বিভ্রান্তি ও বাস্তবতা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানবজাতি। কাজেই নারী ও পুরুষ জ্ঞানের সকল শাখার সঙ্গে জড়িত। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এমন কি সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে নারীর সর্বজনীন অধিকারের কথা উল্লেখ নেই বললেই চলে। এ সকল বিষয় অধ্যয়ন করলে মনে হয়, মানবজাতি একমাত্র পুরুষকে নিয়ে গঠিত; জ্ঞানচর্চার সকল ক্ষেত্রে নারী অবহেলিত। এ অবস্থা ইসলাম সৃষ্টি করেনি।

---

৪. আল-কুরআন, ৪ : ৩২

৫. শাইখ তানতাবী জওহারী, *আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল কুর'আনিল কারীম*, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯১, খ. ৩, পৃ. ৩৮

৬. আল-কুরআন, ৪ : ৭

৭. মাওলানা আবূ মুহাম্মদ আব্দুল হক হাক্কানী, *তাফসীরে হাক্কানী*, নয়া দিল্লী : ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউজ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ১২৯

মানবজীবনে সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। সম্পদ মানুষের সামাজিক অবস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে নারীদের এ অবস্থান তৈরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সমন্বয়, সমঝোতা ও তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা সুষ্ঠু ও সুষম সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা নারী পুরুষের সঠিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সুষম ও সমতাভিত্তিক সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন। নারী-পুরুষের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারে -এ সংক্রান্ত বিষয় আল-কুরআন ও হাদীসে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে জ্ঞানের এ শাখা কেবল নারীর সমস্যা, অধিকার ও দায়িত্ব, তাদের সামাজিক ও জৈবিক (biological) ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং নারী ও পুরুষ পরস্পর এক অপরের সম্পূরক ব্যক্তি হিসেবে জীবনধারণ, কর্মসম্পাদন ও মন আদান-প্রদানের প্রাত্যহিক, বাস্তব ও ব্যবহারিক সমস্যা নিয়ে কীভাবে একে অপরের সঙ্গে কাজ করবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করে। নারী ও পুরুষের সামাজিক সম্পর্ককে বুঝানোর জন্য কোন পরিভাষা ইসলামপূর্ব সময়ে ছিল না।

আল-কুরআন নারী শিক্ষা ও গবেষণা-এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। শুধু নারীদের জীবনমান, অধিকার, চালচলন, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহ সামগ্রিক জীবনকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা 'আন-নিসা' নাযিল করেছেন। এ ছাড়াও কুরআনের অন্যান্য সূরাতেও নারীদের জীবন সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে। যেমন ইসলামী আইনে মহিলারা মাতারূপে-স্ত্রীরূপে-কন্যারূপে এবং বোনরূপে সম্পত্তি লাভ করে। নারী অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে ইসলামের অবদান অস্বীকার করার এখতিয়ার কারো নেই। নারীর অধিকার নিয়ে নারী বাদীগণ যতোই উচ্চকণ্ঠ হোন না কেন তাদের এ বক্তব্যের মূল উৎস আল-কুরআন ও শরী'আহ্ সংশ্লিষ্ট উৎসসমূহ। মাতা, স্ত্রী ও কন্যা-এ তিন ধরনের মহিলা উত্তরাধিকার আইনে চিরস্থায়ী অংশীদার। কোন অবস্থাতেই তারা উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় না। যেমন মাতা তার সন্তানের মৃত্যুতে রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে সর্বাবস্থায়ই অংশীদার। অনুরূপভাবে স্ত্রী তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে (সন্তান থাকাবস্থায় বা না থাকাবস্থায়) অংশীদার। এক কথায় মাতা, স্ত্রী ও কন্যার অংশ উত্তরাধিকার আইনে সুনির্দিষ্ট। এভাবে আল-কুরআনে নারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় সকল অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এ সুনির্দিষ্ট অংশীদারদেরকে বাদ দিয়ে আর যে সব মহিলা আত্মীয় মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে তারা হচ্ছে মাতার দিক থেকে উর্ধ্বগামী বংশধর মহিলাগণ এবং পিতার দিক থেকে উর্ধ্বগামী মহিলাগণ। মাতার দিক থেকে উর্ধ্বগামী বংশধর মহিলাগণ হচ্ছেন- মাতামহী, প্রমাতামহী এবং তৎউর্ধ্বের মহিলাগণ। পিতার দিক থেকে উর্ধ্বগামী মহিলাগণ হচ্ছেন- পিতামহী, প্রপিতামহী এবং তৎ উর্ধ্বের মহিলাগণ। এসব মহিলা কিছু বিশেষ অবস্থায় মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে নতুবা

নয়। যেমন মৃতের মাতা বেঁচে থাকলে মাতামহী উত্তরাধিকারিত্ব হারায়। অনুরূপভাবে পিতার জীবিত অবস্থায় পিতার মাতা অর্থাৎ দাদী মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় না।[৭] এছাড়াও নারীদের কর্মক্ষেত্র, পরিবেশ ও পরিবার ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে আল-কুরআন আলোচনা করেছে।

ইসলামী আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে একজন পুত্রের অংশের অর্ধাংশ কন্যাকে এবং পুত্রের অংশের চেয়েও কম মাতাকে প্রদান করে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে আধুনিক নারীবাদীদের প্রবক্তাদের অভিযোগ উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদের জানা থাকা দরকার, ইসলাম সর্বজনীন বাস্তবসম্মত জীবন বিধান, যার বৈশিষ্ট্য ও অকাট্যতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই প্রকৃতপক্ষে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, ইসলাম সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত অধিকার নারীকে প্রদান করেছে।

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধানের মধ্যে অন্যতম হলো উত্তরাধিকার অংশ বণ্টন। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে জীবিত স্বজনদের কার অংশ কতটুকু তা আল-কুরআন দ্বারা নির্ধারিত। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে একজন মুসলিম বলে দাবী করে থাকেন তাহলে এই মীরাস নিয়ে তার বিতর্কিত কথা বলার কোন সুযোগ নেই। কারণ মুসলিম হলে তাকে তো আল্লাহ্‌র বিধানকেই মেনে নিতে হবে। অথবা সে যদি কোন একান্ত কারণে এ বিধান মেনে চলতে না পারে সেটা একান্ত ভিন্ন বিষয়; কিন্তু সে বলতে পারবেনা যে, আল-কুরআন ভুল মীরাস ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে বা নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। ইসলামের বিধান অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন। এতে পুরুষের অংশ যেমন আছে, তেমনি আছে নারীর অংশ।

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলো আল-হাদীস। কুরআনে সাধারণত আহকাম ও বিধান সম্পর্কে মূল কথাটি বলা থাকে। অর্থাৎ উসূল ও মূলনীতি বর্ণনা করা হয়। তাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক, মাস'আলা-মাসায়িল-এর জন্য হাদীসের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন আল-কুর'আনে সালাত ও যাকাতের আদেশে বলা হয়েছে 'সালাত কায়েম করো', 'যাকাত প্রদান করো'; সালাত আদায়ের পদ্ধতি, রাক'আত সংখ্যা, সময়, আবার যাকাত কারা আদায় করবে, এর শর্ত কী, কীভাবে আদায় করবে ইত্যাকার বিষয়ের বিস্তারিত মাস'আলা-মাসায়িল এসেছে হাদীস থেকে। ইসলাম নারী সমাজের অধিকার রক্ষা ও তাদের সম্পদের হেফাজত ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

---

৭. সাহিদা বেগম, *মুসলিম আইন ও পারিবারিক আদালত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খৃস্টাব্দ, পৃ. ৩৪

আর উত্তরাধিকারের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রত্যেক ওয়ারিস-এর অংশ এক এক করে কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। এর কারণ উল্লেখ করে পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতার অংশ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ﴾

তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের জন্য কে অধিক উপকারী তোমরা তা জানো না। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৮]

ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে যাদের তেমন কোন ধারণা নেই, কেবলমাত্র তারাই আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত মীরাসের নির্ধারিত অংশের বিষয়ে প্রশ্ন ও আপত্তি তোলে। জুলুম ও বৈষম্যের অভিযোগ করে সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলাকে দায়ী করে।

আল্লাহ্ তা'আলা মীরাসের বিধান সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّه وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا وَذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

এইসব আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবেন আল্লাহ্ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাকে লঙ্ঘন করে তিনি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।[৯]

নিম্নে নারীর হিস্যা বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও ইসলামের বিধানাবলির আলোকে আলোচনার প্রয়াস পাব।

১. ইসলামের মীরাস ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব সুসংরক্ষিত। এজন্য কোন ধর্ম, মতবাদ বা জীবন ব্যবস্থায় এর তুলনা বা দৃষ্টান্ত দেখানোর কোন সুযোগ নেই।

২. পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ অংশীদারিত্ব দেয়া হয়েছে। নারীদেরকে ঠকানো হয়েছে বলে যারা প্রচার করেন তারা প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়টি বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করে এর প্রকৃত বিধান চাপে রাখার চেষ্টা করেন্।

৩. যেসব কারণে একজন পুরুষকে দু'জন নারীর সমান অংশীদারিত্ব দেয়া হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে যৌক্তিক, বাস্তব সম্মত ও স্বাভাবিক নীতিমালার কারণেই দেয়া হয়েছে। যেমন :

---

৮. আল-কুরআন, ৪ : ১১

৯. আল-কুরআন, ৪ : ১৩-১৪

- নারী মা হিসেবে কখনো পুরো সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ পায়, কখনো পায় ছয় ভাগের একভাগ।
- নারী দাদী ও নানী হিসেবে পুরো সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ পায়।
- নারী কন্যা হিসেবে কখনো পুরো সম্পত্তির অর্ধেক পায়, দুই বা ততোধিক কন্যা হলে সকলে মিলে তিনভাগের দুই ভাগ পাবে। আর ভাইয়ের সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পাবে।

৪. নারী পৌত্রী হিসেবে দাদার সম্পদ থেকে কখনো অর্ধেক পায়, কখনো ছয়ভাগের একভাগ এবং পৌত্রের সাথে হলে পৌত্রের অর্ধেক পায়।

৫. নারী সহোদরা বোন হিসেবে কখনো অর্ধেক পায়। দুই বা ততোধিক হলে তিন ভাগের দুই ভাগ পায় এবং সহোদর ভাই সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পায়।

৬. নারী বৈমাত্রেয় বোন হিসেবে কখনো অর্ধেক পায়, কখনো ছয়ভাগের এক ভাগ এবং একাধিক থাকলে তিন ভাগের দুই ভাগ পায়। ভাই সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পায়।

৭. নারী বৈপিত্রেয় বোন হিসেবে কখনো ছয় ভাগের এক ভাগ পায়, একাধিক থাকলে তিন ভাগের এক ভাগ পায়।

৮. নারী স্ত্রী হিসেবে কখনো চার ভাগের এক ভাগ, কখনো আট ভাগের এক ভাগ পায়।[১০]

শরীয়তে নারীর নির্ধারিত অংশ অন্যভাবেও দেখানো যেতে পারে

ক. স্থায়ী ওয়ারিসদের মাঝে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান, ওয়ারিছদের মধ্যে নিকটবর্তীদের কারণে দূরবর্তীগণ কখনো অংশ কম পায়। কখনো সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। কিন্তু ছয় প্রকারের ওয়ারিস এমন আছে যারা কখনো বঞ্চিত হয় না। তাদের তিন প্রকার পুরুষ : পিতা, পুত্র ও স্বামী। আর তিন প্রকার নারী : মাতা, কন্যা ও স্ত্রী। এরা সকলেই স্থায়ী ওয়ারিস।

খ. কুরআন মাজীদে যে সকল ওয়ারিসের অংশ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে 'যাবিল ফুরুয' বলে। যাবিল ফুরুযের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ। মোট ১২ প্রকার ওয়ারিস যাবিল ফুরুযের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ৪ প্রকার পুরুষ এবং ৮ প্রকার নারী।

যাবিল ফুরুয পুরুষগণ হচ্ছে : ১. স্বামী, ২. পিতা, ৩. দাদা, দাদার পিতা, ৪. বৈপিত্রেয় ভাই।

---

১০. সাহিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

যাবিল ফুরুয নারীগণ হচ্ছে : ১. স্ত্রী, ২. মাতা, ৩. দাদী, নানী, দাদীর মাতা, দাদার মাতা, ৪. কন্যা, ৫. পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রের কন্যা, ৬. সহোদরা বোন, ৭. বৈমাত্রেয় বোন, ৮. বৈপিত্রেয় বোন।

গ. আসাবাতেও নারী বেশি। যাবিল ফুরুযগণ তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্টাংশ যারা পায় তাদেরকে 'আসাবা' বলে। আসাবা তিন স্তরের। প্রথম স্তরে চার প্রকারের পুরুষ, দ্বিতীয় স্তরে চার প্রকারের নারী, এবং তৃতীয় স্তরে শুধু এক প্রকারের নারী।

ঘ. কুরআন মাজীদে উল্লেখিত মীরাসের নির্ধারিত অংশীদারিত্ব সর্বমোট ৬টি। আর তা হলো দুই ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ এবং তিন ভাগের দুই ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ ও ছয় ভাগের এক ভাগ। এই অংশগুলো যাদের জন্য নির্ধারিত তাদের মধ্যেও নারীর সংখ্যা বেশি। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

দুই ভাগের এক ভাগ : বিভিন্ন অবস্থায় মোট পাঁচ প্রকারের ওয়ারিস এই অংশ পায়। তারা হচ্ছে ১. স্বামী, ২. কন্যা, ৩. পুত্রের কন্যা, ৪. সহোদরা বোন, ৫. বৈমাত্রেয় বোন। লক্ষ্য করতে হবে এদের চার প্রকারই নারী, পুরুষ মাত্র একজন।

চার ভাগের এক ভাগ : এটি পায় দুই প্রকারের ওয়ারিস। ১. স্ত্রী, ২. স্বামী।

আট ভাগের এক ভাগ : এটি স্ত্রীর অংশ।

তিন ভাগের দুই ভাগ : মোট চার প্রকার ওয়ারিছের জন্য এই অংশ নির্ধারিত। এরা সকলেই নারী। ১. দুই বা ততোধিক কন্যা, ২. দুই বা ততোধিক পৌত্রী, ৩. দুই বা ততোধিক সহোদরা বোন, ৪. দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন।

তিন ভাগের এক ভাগ : মোট তিন প্রকার ওয়ারিছের জন্য এই অংশ নির্ধারিত। তার মধ্যে দুই জন-ই নারী। ১. মাতা, ২. বৈপিত্রেয় বোন একাধিক হলে।

ছয় ভাগের এক ভাগ : মোট সাত প্রকার ওয়ারিসের জন্য এই অংশ নির্ধারিত। তন্মধ্যে দুই প্রকার পুরুষ ও পাঁচ প্রকার নারী : ১. পিতা, ২. দাদা, ৩. মাতা, ৪. পৌত্রী (একজন হলে), ৫. বৈমাত্রেয় বোন, ৬. দাদী, নানী, দাদার মাতা, ৭. বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন।

নারীর অংশ নির্ধারিত থাকার সুফল

প্রকৃত কথা হলো, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব সংরক্ষিত, সুনিশ্চিত, সুসংহত ও সম্মানজনক। আর নারীর অংশ নির্ধারিত হওয়ার কারণে সর্বাবস্থায় সে তার নির্ধারিত অংশ পায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে একই স্তরের পুরুষের অংশ নির্দিষ্ট না থাকার কারণে সে কোন অংশ পায় না। এ ক্ষেত্রে আমরা নিচের দুটি উদাহরণ লক্ষ্য করতে পারি।

১. রোকেয়া সুলতানা নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, একজন আপন বোন ও একজন বৈমাত্রেয় বোন রেখে গেছেন।

২. পক্ষান্তরে শামীমা আক্তারও একজন নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, একজন সহোদর বোন ও এক বৈমাত্রেয় ভাই রেখে গেছেন।

এখানে প্রথম উদাহরণে রোকেয়া সুলতানার স্বামী ৪২.৮৬%, তার সহোদরা ৪২.৮৬% এবং বৈমাত্রেয় বোন ২৮.২৮% পাবে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে শামীমা আক্তারের স্বামী ৫০%, এবং বাকী ৫০% পাবে তার সহোদরা বোন। তার বৈমাত্রেয় ভাই বঞ্চিত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে , রোকেয়া সুলতানার বৈমাত্রেয় বোন সাত ভাগের এক ভাগ তথা শতকরা ১৪.২৮৫% অংশ পেলেও ঐ আত্মীয়দের উপস্থিতিতেই শামীমা আক্তার-এর বৈমাত্রেয় ভাই কিছুই পায়নি।

নিকটতর ওয়ারিস থাকার কারণে সে সকল দূরবর্তী ওয়ারিস সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় তাদের মধ্যেও পুরুষ বেশি এবং নারী কম। অর্থাৎ বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের সংখ্যা ১১ এবং নারীর সংখ্যা ৫ জন। নিম্নে এদের বর্ণনা দেয়া হলো :

১. দাদা : পিতা থাকলে, তেমনি পরদাদা বঞ্চিত হয় দাদা থাকলে।

২. সহোদর ভাই : পিতা, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের কোন একজন থাকলে।

৩. বৈমাত্রেয় ভাই : পিতা, পুত্র, পৌত্র বা সহোদর ভাইয়ের কেউ থাকলে, তেমনি সহোদর বোন থাকলে (যদি কন্যার কারণে বোন আসাবা হয়)।

৪. বৈপিত্রেয় ভাই : পিতা, দাদা বা পরদাদা, তেমনি ছেলে কিংবা মেয়ে থাকলে।

৫. পৌত্র : পুত্র থাকলে। ঠিক তেমনি প্রপৌত্র বঞ্চিত হয় পৌত্র থাকলে।

৬. ভাতিজা : (সহোদর ভাইয়ের পুত্র) পিতা, দাদা, পুত্র, কিংবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্র কোন একজনের উপস্থিতিতে, তেমনি সহোদর ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপস্থিতিতে।

৭. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র : পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রের উপস্থিতিতে। তেমনি সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই কিংবা সহোদর ভাইয়ের পুত্র থাকলে।

৮. চাচা (পিতার সহোদর ভাই) : বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র থাকলে কিংবা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

৯. চাচা (পিতার বৈমাত্রেয় ভাই) : আপন চাচা থাকলে কিংবা আপন চাচা যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

১০. চাচাত ভাই (পিতার সহোদর ভাইয়ের পুত্র) : চাচা পিতার বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে, কিংবা এই চাচা যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

১১. চাচাত ভাই (পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র) : আপন চাচার পুত্র থাকলে কিংবা ঐ চাচাত ভাই যাদের কারণে বঞ্চিত তারা কেউ থাকলে।

নারীদের মধ্যে ৫ জন :

১. দাদী, নানী : মা থাকলে।

২. পৌত্রী : পুত্র থাকলে, কিংবা একাধিক কন্যা থাকলে। (যদি পৌত্রী আসাবা না হয়)।

৩. সহোদরা বোন : পিতা, পুত্র, পৌত্র কেউ থাকলে।

৪. বৈমাত্রেয় বোন : সহোদরা বোন (যখন আসাবা হয়) পিতা, পুত্র, পৌত্র কেউ থাকলে। তেমনি দুই বা ততোধিক সহোদরা বোন থাকলে (যদি তারা আসাবা না হয়)।

৫. বৈপিত্রেয় বোন : পিতা পুত্র কন্যা কোন একজন থাকলে তেমনি পৌত্র বা পৌত্রী থাকলে।

এক পুরুষ দুই নারীর অংশ পায় এটা ইসলামী উত্তরাধিকারের সর্বক্ষেত্রের নীতি নয়। ইসলামের সম্পূর্ণ মীরাস ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, ইসলামে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ হিস্যা দেয়া হয়েছে। অপপ্রচার ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ধারণা দেয়া হয় যে 'এটা মূলত নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক চেতনারই প্রতিফলন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেয়া প্রয়োজন যে, মীরাসের হিস্যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। কুরআন মাজীদে তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা বৈষম্যের কথা বলেছেন তাদের জন্য এ বিষয়ে আরো গভীর গবেষণা ও অধ্যয়ন প্রয়োজন। এ জন্য আল-কুরআনের আলোকে অধ্যবসায় জরুরী। কোন ধরনের বিভ্রান্তিতে সাড়া দেয়া যাবে না, বৈষম্যের কথা বলাই বিভ্রান্তি। এটা অসত্য ও মিথ্যা প্রচারণা। কারণ গোটা মীরাস ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে তিনটি অবস্থা দেখা যায় :

১. নারী কখনো পুরুষের সমান অংশ পেয়ে থাকে।

২. কখনো পুরুষের চেয়ে বেশি অংশ পেয়ে থাকে।

৩. কখনো পুরুষ বেশি অংশ পেয়ে থাকে।

নিচে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

নারীর অংশ পুরুষের সমান

ক. দাদা-দাদীর দু'জনের অংশ ছয় ভাগের একভাগ, যদি মৃতের পুত্র বা পৌত্র থাকে। অর্থাৎ পুত্র ৫৪.১৬৬%, দাদী ১৬.৬৬%, দাদা ১৬.৬৬%, স্ত্রী ১২.৫%।

খ. পিতা মাতা দু'জনেরই অংশ ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র বা পৌত্র থাকে। অর্থাৎ পিতা ১৬.৬৬%, মাতা ১৬.৬৬%, স্ত্রী ১২.৫% ও পুত্র ৫৪.১৬৬%।

গ. বৈপিত্রেয় ভাই-বোন একত্রে থাকলে তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নিবে। অর্থাৎ বৈপিত্রেয় এক ভাই এক বোন ৩৩.৩৩% এবং সহোদরা দুই বোন ৬৬.৬৬% পাবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾

যদি পিতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর কোন উত্তরাধিকারী থাকে অথবা যদি তার থাকে এক (বৈপিত্রেয়) ভাই বা ভগ্নি তাহলে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সম অংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশে।[১১]

ইমাম ইবনু শিহাব আয-যুহরী [৫৮-১২৪ হি.] রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قضى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن ميراث الإخوة من الأم بينهم، للذكر مثل الأنثى

উমর রা. বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রে ফয়সালা দিয়েছিলেন যে, তারা একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সমান অংশীদার হবে/ তারা উভয়েই সমঅংশীদার হবে'।[১২]

এসব উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, একই মৃত ব্যক্তির মীরাসে বিশেষ কিছু নারী ও পুরুষকে সমান হিস্যা দেয়া হয়েছে।

নারীর অংশ পুরুষের চেয়ে বেশি

মীরাসে পুত্র ও ভাইয়ের অংশ যেহেতু নির্ধারিত নয়, তাই ভাই ও পুত্র কখনো বোন ও কন্যা থেকে কম পেয়ে থাকে। যেমন মৃতের পিতা, মাতা ও স্ত্রী বা স্বামীর সাথে শুধু দুই কন্যা থাকলে কন্যা যতটুকু পায় শুধু দুই পুত্র থাকলে তারা তার চেয়ে কম পেয়ে থাকে।

প্রথম ক্ষেত্রে মীরাসের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্ত্রী ১১.১১%, পিতা ১৪. ৮১%, মাতা ১৪.৮১ এবং প্রত্যেক কন্যা ২৯.৬২৯% করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মীরাসের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্ত্রী ১২.৫%, পিতা ১৬.৬৬%, মাতা ১৬.৬৬% এবং প্রত্যেক পুত্র ২৭.০৮% করে পাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম ক্ষেত্রে প্রত্যেক কন্যা ২৯.৬২৯% পাচ্ছে, অথচ ঐ আত্মীয়দের সাথে পুত্র পাচ্ছে ২৭.০৮%।

আরেকটি উদাহরণ : মৃত ব্যক্তির স্বামী, পিতা ও মাতার সাথে শুধু দুই কন্যা থাকলে কন্যারা যে অংশ পায় শুধু দুই পুত্র থাকলে পুত্ররা তার চেয়ে কম পায়। কারণ প্রথম

---

১১. আল-কুরআন, ৪ : ১২

১২. ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবন আবী হাতিম, *তাফসীর ইবন আবী হাতিম*, ৩য় খ, তাহকীক: আসআদ মুহাম্মাদ তাইয়্যিব, (সিডন, আল-মাকতাবা আল-আসরিয়াহ, তা.বি) পৃ. ৮৮৮

ক্ষেত্রে মীরাসের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্বামী ১৯.৯৯%, পিতা ১৩.৩৩%, মাতা ১৩.৩৩% এবং প্রত্যেক কন্যা ২৬.৬৬% করে পাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মীরাসের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্বামী ২৫% পিতা ১৬.৬৬%, মাতা ১৬.৬৬% এবং প্রত্যেক পুত্র ২০.৮৩% করে পাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক কন্যা ২৬.৬৬% সম্পদ পেয়েছে অথচ ঐ আত্মীয়দের সাথেই প্রত্যেক পুত্র পাচ্ছে ২০.৮৩%।

তেমনি কখনো বোন ভাই অপেক্ষা বেশি পায়। নিচের ছকটি লক্ষণীয় : মৃত ব্যক্তির স্বামী, মাতা, বৈপিত্রেয় বোন, বৈমাত্রেয় বোন থাকলে প্রত্যেকের মীরাসের হিস্যা হয় নিম্নরূপ : স্বামী ৩৭.৫%, মাতা ১২.৫%, বৈপিত্রেয় বোন ১২.৫%, বৈমাত্রেয় বোন ৩৭.৫%। পক্ষান্তরে স্বামী মাতা বৈপিত্রেয় বোনের সাথে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে তাহলে প্রত্যেকের অংশ হয় নিম্নরূপ : স্বামী ৫০%, মাতা ১৬.৬৬%, বৈপিত্রেয় বোন ১৬.৬৬% ও বৈমাত্রেয় ভাই ১৬.৬৬%। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ক্ষেত্রে যে আত্মীয়দের সাথে বৈমাত্রেয় বোন শতকরা ৩৭.৫% পেয়েছে, তাদের সাথেই বৈমাত্রেয় ভাই পেয়েছে তার অর্ধেকেরও কম। এই উদাহরণগুলোর সার কথা হলো, একই ধরনের আত্মীয় রেখে দু'জন ব্যক্তি মারা গেছে; কিন্তু আত্মীয়তার ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়েও এক মৃত ব্যক্তির নারী ওয়ারিসরা অপর মৃত ব্যক্তির পুরুষ আত্মীয়দের চেয়ে বেশি সম্পদ পেয়েছে। আর একই মৃত ব্যক্তির পুরুষ ওয়ারিসের চেয়ে নারী ওয়ারিস বেশি পাওয়ার দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্বে গিয়েছে। যেখানে মৃতের কন্যাকে মৃতের স্বামীর চেয়ে এবং মৃতের কন্যা মৃতের পিতার চেয়ে বেশি পেয়েছে।

সমপর্যায়ের পুরুষ মীরাস পায় না কিন্তু নারী পায়

১. নানী ছয়ভাগের এক ভাগ পায়, কিন্তু নানা কিছুই পায় না।

২. মৃতের স্বামী এবং সহোদরা বোনের সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোন অংশ পায়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় ভাই অংশ পায় না।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষকে সর্বক্ষেত্রে অধিক অংশ দেয়া হয়নি। কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের হিস্যা সমান। কোন ক্ষেত্রে বেশি আর দুই মৃত ব্যক্তির মীরাস তুলনা করলে যেমন পাওয়া যায় তেমনি এক মৃত ব্যক্তির মীরাসেও পাওয়া যায়। সুতরাং ইসলামে পুরুষের হিস্যা নারীর দ্বিগুণ- এটি মীরাস ব্যবস্থার একটি খণ্ডিত উপস্থাপনা। যা নারীবাদীরা ভুল ধারণা প্রসূত উপস্থাপন করে থাকেন।

এক পুরুষ পায় দুই নারীর সমান অংশ

তৃতীয় অবস্থাটি হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে একজন পুরুষ দুই জন নারীর সমান অংশ পেয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দান করেছেন, এক পুত্র পাবে দু কন্যার সমান। আর যদি শুধু কন্যাই দুইজন বা দুই এর বেশি হয়, তাহলে তারা পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর শুধুমাত্র একজন কন্যা থাকলে সে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।[১৩]

মৃতের পুত্র-কন্যা দুটোই যদি থাকে তাহলে পুত্র পাবে কন্যার দ্বিগুণ। তেমনি পৌত্র এবং পৌত্রী থাকলে পৌত্র পাবে পৌত্রীর দ্বিগুণ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾

(হে রাসূল!) তারা আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চাইছে। আপনি বলে দিন, কালালা সম্পর্কে আল্লাহ্ বিধান দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, আর তার মাত্র একজন বোন জীবিত থাকে তাহলে সে মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর দুই বোন থাকলে তারা মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই ও বোন এক সাথেই থাকে, তাহলে একজন ভাই দুইজন বোনের সমান অংশ পাবে।[১৪]

এই আয়াতের বিধান হলো, মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই-বোন দুজনই যদি থাকে তাহলে ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ। একই কথা বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উপরের দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হলো, ইসলামের মীরাস বণ্টনের মূলভিত্তি কখনো এই নয় যে, কাউকে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে অধিক দেয়া হবে আর কাউকে শুধু নারী হওয়ার কারণে কম দেয়া হবে বা বঞ্চিত করা হবে। এ কারণেই উপরে আমরা দেখেছি যে, সর্বক্ষেত্রে না পুরুষকে, না নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বরং কোথাও পুরুষকে অগ্রাধিকার, আবার কোথাও নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ সবই আল্লাহ্র বিধান। তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। সুতরাং একজন মুসলিমের কাজ হলো আল্লাহ্র বিধানের সামনে সমর্পিত হওয়া। কারণ এই আসমানী বিধানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ্রই জানা। একজন মুসলিম হয়ে এ আসমানী বিধান নিয়ে কোন বিতর্কের সুযোগ বা কারণ কোনটিই নেই।

একজন পুরুষ দুইজন নারীর সমান অংশ পাওয়ার কারণ

এ কথা সুস্পষ্ট যে, কম-বেশি শুধু নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে নয়; বরং দায়িত্ব, খরচ ও মৃতের সাথে সম্পর্কের মতো গভীর ও মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যারা

---

১৩. আল-কুরআন, ৪ : ১১

১৪. আল-কুরআন, ৪ : ১৭৬

দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রাপ্তি ও অধিকারের অভিন্নতার দাবি করেন তাদের বক্তব্যের অসারতা বোঝার জন্য অনেক বেশি গভীর বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তাদের দর্শন মেনে নিলে গোটা পৃথিবী অচল হয়ে যাবে।

এ পৃথিবী একটি নিয়মে চলে। সে নিয়মও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। মানুষের জীবন চলার জন্যও সর্বজনীন জীবন বিধান রয়েছে। মীরাসের ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত নীতি হলো الغُنمُ بالغُرمِ -"দায় অনুযায়ী প্রাপ্তি"।[১৫] অর্থাৎ যার দায় বেশি তার প্রাপ্তিও বেশি। যার দায় কম তার প্রাপ্তিও কম। পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পুরুষের উপর। শত্রুর মোকাবিলা করার দায়িত্বও পুরুষের। পরিবার, সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ, তাদের চিকিৎসা ও বাসস্থানের দায়িত্বও পুরুষের উপর। নারীর উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। বরং সকল খরচ পুরুষের বহন করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, যদি কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলেও ইদ্দত চলাকালীন ভরণ-পোষণ ও থাকার ব্যবস্থা পুরুষের দায়িত্বে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾

তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদের কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয় তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ করো তবে অন্য নারী স্তন্য দান করবে।[১৬]

সন্তান এবং সন্তানের মাতার খরচের দায়িত্ব সন্তানের পিতার উপর

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

---

১৫. ইবনু আমীরিল হাজ্জ, *আত-তাকরীর ওয়াত তাহরীর ফী 'ইলমিল উসূল*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৬, খ. ২, পৃ. ২৬৯

১৬. আল-কুরআন, ৬৫ : ৬

আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের পিতার উপর দায়িত্ব নিয়ম অনুযায়ী সন্তানের মাতার খোর-পোষের (খাওয়া-পরার) ব্যবস্থা করা। কাউকে তার সামর্থ্যাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতামাতা ইচ্ছা করে তাহলে উভয়ে পরামর্শ করে দু'বছরের ভিতরেই দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ ভাল করেই দেখেন।[১৭]

মোহর আদায়ের দায়িত্ব পুরুষের উপর। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশিমনে তাদের মোহর দিয়ে দাও।[১৮]

যারা নারীর মীরাস অংশ বণ্টন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে থাকেন তাদের নিকট প্রশ্ন! বলুন তো পুরুষের পক্ষ থেকে কেন মোহর আদায় করতে হবে? দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার তো নারী-পুরুষ উভয়ই। তারা এ বিষয়ে কোন উত্তর দিতে পারবে না। এর ব্যাখ্যা ইসলাম দিয়েছে। সুতরাং আল কুর'আনের কোন বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে আমাদের কুরআন পড়তে হবে, বুঝতে হবে, সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। তবেই কল্যাণ।

কোন কারণে দাম্পত্য বিচ্ছেদ হয়ে গেলে প্রদেয় মোহর ও অন্যান্য সম্পদ থেকে কিঞ্চিত পরিমাণও ফেরত নেয়া নিষেধ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾

যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও (সঙ্গত কারণে শরী'আহ সম্মত পন্থায় তালাক ও বিবাহের মাধ্যমে) এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।[১৯]

বর্তমান সময়ে যারা নারীর সমঅধিকার ও নারীর মীরাস বণ্টন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকেন, তারা তো এ বিষয়েও কোন কথা বলেন না যে, যখন কোন

---

১৭. আল-কুরআন, ০২ : ২৩৩
১৮. আল-কুরআন, ০৪ : ৪
১৯. আল-কুরআন, ০৪ : ২০

নারীর পক্ষ থেকে (সঙ্গত কারণে হোক বা নৈতিক পদস্খলনের কারণে হোক) দাম্পত্য বিচ্ছেদ ঘটে তখনো তো ক্ষেত্র বিশেষে নিরপরাধ পুরুষটির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিক বিবেচনায়ও আনা হয় না। অথচ এমনও হয় যে, তার সারা জীবনের অর্জন সবই ঐ স্ত্রীকে দিয়েছিল। এ স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও আবারও মোহর পাবে। কিন্তু পুরুষ আবার বিবাহ্ করলে সেখানেও মোহর দিতে হবে। মোট কথা পুরুষের উপর খরচের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে; নারীর উপরে নয়।

এ ছাড়াও যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি, তা হলো আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী হিস্যার বিধানটি এজন্যই এরূপ করেছেন যে, আজ যিনি পিতার ঘরে কুমারী কন্যা আগামীতে তিনিই স্বামীর ঘরের সফল গৃহ বধূ, তার সুখী সংসার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীকে অর্থনৈতিকভাবে অধিক শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন; কেননা স্বামীর সংসারে এসে সে সরাসরি স্বামীর সম্পদের তত্ত্বাবধায়িকা ও অধিকারিণী হয়ে যায়। কিন্তু এরূপ না হয়ে যদি তথাকথিত প্রগতিবাদীদের দাবীর অনুরূপ হতো, তাহলে স্বামীর সংসার এর দায়িত্বশীলা হয়ে পিতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে হিস্যা গ্রহণ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়াত। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজে নারীদের হিস্যা বুঝে পাওয়ার বাস্তব চিত্র আমাদের এ চিন্তারই জন্ম দেয়। এ সম্পর্কে Safia Iqbal নামের জনৈক চিন্তাবিদ বলেন,

> However, a closer scrutiny reveals that such an order is, in fact, the very echo of justice. the responsibility of earning a livelihood and supporting the family is not placed on woman in Islam. In case of a man's death, it is the son, and not the daughter or the widow, who is responsible for the maintenance of the family. Hence, the son's increased share in the property is meant to provide him assistance in maintaining the family. In fact, it would have been injustice if woman who was not bound to contribute anything in the way of earning towards the family upkeep, got an equal share. As it is, her net share amounts to more than that of her brother or son when her Mahr, her marriage gifts, her ornaments and personal property which belong to her solely, are considered.[20]

---

২০. Safia Iqbal, *WOMAN AND ISLAMIC LAW,* New Delhi : Adam Publishers & Distributors, 2004, pp. 176-177

অর্থাৎ ইসলাম জীবন-যাত্রার খরচ নির্বাহ করার জন্য আয়-উপার্জন করা এবং পরিবারকে সাহায্য-সহযোগিতা করার দায়িত্ব কোন স্ত্রীর উপর অর্পণ করেনি। পিতার মৃত্যুর পর পরিবার পরিচালনা ও পারিবারিক খরচ নির্বাহের দায়িত্ব বর্তায় পুত্রের উপর; কন্যা বা বিধবার উপর নয়। আর এ কারণেই পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ও খরচ নির্বাহের সহযোগিতার জন্য পুত্রের অংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক খরচ নির্বাহের জন্য উপার্জন করতে নারী বাধ্য নন। পৈতৃক সম্পত্তিতে তার অংশ যদি সমান হতো, তবে তা যথাযথ ও ইনসাফপূর্ণ হতো না। তাছাড়া একজন নারীর মোহর, বিবাহের উপঢৌকন, অলংকার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিবেচনায় এনে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার প্রকৃত অংশ ভাই এবং পুত্রের চেয়েও বেশি। সুতরাং এ বিষয়ে বিতর্কের কিছু নেই। এভাবে ইসলাম বাস্তব প্রয়োজন ভিত্তিক নারী অধ্যয়ন ও গবেষণার পথ বাতলিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস এবং ইসলামের আনুষঙ্গিক উৎসসমূহকে মূলনীতি ধরতে হবে।

এ ছাড়াও

* নারী যখন কন্যা তখন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার জিম্মায়। তার বিয়ের পূর্ব সময় পর্যন্ত তার সকল দায়-দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত।
* বিয়ের সময় থেকে মোহর সহ সকল মৌলিক অধিকার ও জীবনের সকল চাহিদা স্বামীর কাছ থেকে লাভ করবে।
* নারী বিধবা হলে তার দায়িত্ব, পিতা, পুত্র ও ভাইয়ের উপর।
* নারী যখন মা, দাদী ও নানী তখন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামী, পুত্র, পৌত্রদের উপর।

মোট কথা, নারী সকল স্তরেই পুরুষের দায়িত্বে পরিবেষ্টিত। ফলে পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং খরচও অনেক বেশি। তাই দায় অনুযায়ী তার প্রাপ্তিও বেশি হওয়াটাই সাম্য ও ইনসাফের দাবি। এ ধরনের দায়িত্ব নারীদের উপরে নেই। এক কথায় তারা দায় মুক্ত। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নারীরা যা পেয়েছে, সে পরিমাণ সম্পদ আসলে তাদের প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে পুরুষ যেটুকুই পেল তার দ্বারা নিজের সংসার ও সংশ্লিষ্টদের ভরণ-পোষণ চালাতে হিমশিম খায়। এ দিক থেকে বিচার করলে পুরুষের প্রাপ্তি বেশি নয়। পুরুষ সর্বদাই দায়িত্বশীল। মুসলিমের জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে জানা। যখন কুরআন ও হাদীসের অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে বিধি-বিধান জানা হয়ে গেল তখন নিজে আমল করতে হবে এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

নারীর উত্তরাধিকারগত অবস্থান সর্বজনীন; কিন্তু এ বিষয়টির সফল বাস্তবায়ন নিয়ে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় চরম বৈষম্য লক্ষণীয়। নারী সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নিকটাত্মীয়দের দ্বারা চরম বৈষম্যের শিকার। সরেজমিনে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার তাকালে তার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। ষাট বছর বয়সী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক (ছদ্মনাম : রহিমা বেওয়া) বলেন, "আমি এখনো আমার বাবা-মায়ের সম্পদ আমার ভাইদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারিনি, বরং আমার ভাইদেরকে এ সম্পদ প্রাপ্তির কথা জানালে আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।"[২১] আবার ৪০ বছর বয়সী (ছদ্মনাম : আফরোজা বলেন, "আমার পিতা মারা গেছেন ৫ বছর আগে ভাইদের কাছে প্রাপ্য সম্পদের দাবি করলে আমার সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে।"[২২] অপর একজন নারী (ছদ্মনাম : মালেকা আকতার) বলেন, "আমি বাবা-মায়ের যে পরিমাণ সম্পদের অধিকারী তার বর্তমান বাজার মূল্য নূন্যতম ৩০ লক্ষ টাকা; কিন্তু আমার ভাইয়েরা সে সম্পদ অন্যত্র বিক্রি করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অপরপক্ষে তারা এ সম্পদ সর্বসাকুল্যে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে নিজেদের নামে দলিল করে দিতে এক পর্যায়ে বাধ্য করেছে।"[২৩]

প্রকৃতপক্ষে উপর্যুক্ত সামাজিক চিত্র বাংলাদেশের নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদ প্রাপ্তির বাস্তব অবস্থা। যা সত্যিই অনভিপ্রেত, মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও আল-কুরআন দ্বারা নির্ধারিত বিধি-বিধানের পরিপন্থী ও গর্হিত কাজ। এ সংকীর্ণতা ও হীনকর্মের বলয় থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরী। এ অবস্থার ফলে ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালবাসার নজিরবিহীন বিপর্যয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, নারী সমাজ চরমভাবে অধিকারহীনতা এবং বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। নারী তার আপনজনদের দ্বারাই নির্যাতন ও হয়রানিতে অসহায় হয়ে পড়েছে। এটা মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মীরাস হিস্যার ব্যাপারে আরো মনোযোগী ও যত্নশীল হতে হবে। হিস্যা বুঝে নিতে প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। আর রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি আমাদের আহ্বান, যে সকল নাগরিক নারীর হিস্যা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় ও হয়রানি করে, তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

---

[২১] সরেজমিন সাক্ষাৎকার, গ্রাম : চকলক্ষ্মীপুর, ডাকঘর : পুষপপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা। তাং- ১৫.০৮.২০১৫

[২২] সরেজমিন সাক্ষাৎকার, গ্রাম : চকলক্ষ্মীপুর, ডাকঘর : পুষপপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা। তাং- ১৭.০৮.২০১৫

[২৩] সরেজমিন সাক্ষাৎকার, গ্রাম : ধোপাঘাটা, ডাকঘর : পুষপপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা। তাং- ১৮.০৮.২০১৫

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলাম নারী-পুরুষের অধিকার অত্যন্ত ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রদান করেছে। ইসলামের বিধান সামগ্রিক; এটি মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ্ স. প্রদর্শিত জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের প্রয়াস। ইসলামে মানুষের জ্ঞান, আত্মা, বৈষয়িক ও নৈতিক বিষয়াদিসহ সর্বদিক অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান সময়ে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের বাইরে নারীর প্রগতি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তার মধ্যে সত্যের উপাদান অনেক কম এবং মিথ্যাই বেশি। মুসলিম সমাজের নারীদের স্বাধীনতার কোন কমতি নেই। ইসলাম তাদের স্বাধীন ও সম্মানিত করেছে। ইসলামের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বাস্তবায়নের ব্যর্থতার কারণেই আমাদের সমাজে মহিলারা অধিকার বঞ্চিত এবং নিগৃহীত। যারা নারীর অধিকার ও নারীর মীরাস বণ্টন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা তো এ বিষয়েও কোন চিন্তা করেন না যে, যখন কোন নারীর পক্ষ থেকে (সঙ্গত কারণে হোক বা নৈতিক পদস্খলনের কারণে হোক) দাম্পত্য বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তখনো তো ক্ষেত্র বিশেষে নিরাপরাধ পুরুষটির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিক বিবেচনায়ও আনা হয় না। অথচ এমনও হয়ে থাকে যে, তার সারা জীবনের অর্জন সবই ঐ স্ত্রীকে দিয়েছিল। এ স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও আবারও মোহর পাবে। কিন্তু পুরুষ আবার বিবাহ করলে সেখানেও মোহর দিতে হবে। তাছাড়া পুরুষের উপর খরচের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, নারীর উপরে নয়। প্রকৃতপক্ষে নারীদের উত্তরাধিকার অংশীদারিত্ব নিয়ে বিভ্রান্তির মূল উদ্দেশ্য হলো, নারী-পুরুষের মধ্যে ইসলাম নির্ধারিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে এক স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে বসবাস করার সর্বজনীন কল্যাণময় ইসলামী জিন্দেগী ধুলিসাত করে নারীকে পুরুষের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে ইসলামের সুমহান আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করা। সুতরাং আমরা বলবো, ইসলাম নারী সমাজকে সম্মানিত করেছে, উত্তরাধিকার অংশীদারিত্বসহ সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত করেছে যেখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন, এখানে বিতর্ক সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

মাকাসিদুশ শরী'আহ : হাজিয়্যাত প্রসঙ্গ

শাহাদাৎ হুসাইন খান*

[**সারসংক্ষেপ** : *ইসলামী জ্ঞানের শাখা হিসেবে ইসলামের স্বর্ণযুগে ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ -এর যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকেই এর শাখা-প্রশাখাও বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টীয় বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান পর্যন্ত উসূলুল ফিক্হের যে শাখাটি সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে সেটি হচ্ছে মাকাসিদুশ শরী'আহ্। চলমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাজিয়্যাত প্রসঙ্গটিকে বিশ্লেষণ করা এবং মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা, প্রযোজ্যতা ও উপযোগিতা উপস্থাপন করা। অত্র প্রবন্ধে মাকাসিদুশ শরী'আহ্-এর পরিচয় দিয়ে এর প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। তারপর হাজিয়্যাত পরিচিতি ও মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি প্রসঙ্গে যরুরিয়্যাত ও হাজিয়্যাত-এর মাঝে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে আকীদাহ্, ইবাদাত, প্রথা, মু'আমালাত ও অপরাধ বা দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ্-এর প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। মানবজীবনের প্রায় সকল দিক ও বিভাগে হাজিয়্যাতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রমাণিত। ইসলামী শরী'আহ্র দর্শনতাত্ত্বিক এই দিকটির উপর আরো গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন মানবজীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করবে, অপরদিকে বহু সমস্যা দূর করে জীবনকে করবে প্রগতিশীল।*]

ভূমিকা

মাকাসিদুশ শরী'আহ্ ইসলামী শরী'আহ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বহুকাল থেকে উসূলুল ফিকহের বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে এর গুরুত্ব উম্মাহ্র সামনে তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ইমাম আশ-শাতিবী রহ.। পরবর্তীকালে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্, ইবনুল কায়্যিম রহ. প্রমুখ শরী'আহ্ বিশারদগণ বিষয়টিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ের উপর পূর্ণাঙ্গ বই রচনা করেছেন আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ আত-তাহির ইবনু আশূর ও আল্লাল আল-ফাসী। বিগত তিন দশক ধরে এ বিষয়টি শরী'আহ্ গবেষকদের অন্যতম প্রধান গবেষণা-ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক চর্চা শুরু হয়ে যায়। হাজিয়্যাত মাকাসিদুশ শরী'আহ্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এ প্রবন্ধে মাকাসিদ ও হাজিয়্যাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা-১০০০

মাকাসিদুশ শরী'আহ্-এর সংজ্ঞা

মাকাসিদুশ শরী'আহ পরিভাষাটি দু'টি শব্দ, যথাক্রমে মাকাসিদ (مقاصد) ও আশ-শারী'আহ (الشريعة)-এর সমন্বয়ে গঠিত। এজন্য মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর সংজ্ঞা দেয়ার আলোচনাটিকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয়া যায়।

এক. মাকাসিদ-এর শাব্দিক অর্থ

মাকাসিদ শব্দটি মাকসাদ (مقصد) শব্দের বহুবচন। মাকসাদ শব্দটি কাসাদ (قصد) ক্রিয়া থেকে নেয়া হয়েছে। কাস্‌দ (قصد) এবং মাকসাদ (مقصد) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন অভিধানে দেখা যায়, কাস্‌দ বা মাকসাদ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন, সরল পথ, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গন্তব্য, বাসনা ইত্যাদি।[১]

দুই. আশ-শরী'আহ-এর সংজ্ঞা

শরী'আহ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পথ, পন্থা, আইন, বিধান, ধর্ম, পদ্ধতি ইত্যাদি।[২] তবে আরবদের ভাষায় সাধারণত শরী'আহ বলতে পানি পানের স্থান, ঘাট, ঝর্ণা ইত্যাদি বুঝায়।[৩]

- **ইসলামী শরী'আহ্-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ড. আব্দুল করীম যায়দান বলেন,**

  الأحكام التي شرعها الله لعباده

  মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যেসব বিধি বিধান জারি করেছেন তাকে শরী'আত বলা হয়।[৪]

- **মান্না' আল-কাত্তান তার "তারীখুত তাশরীইল ইসলামী" গ্রন্থে ইসলামী শরী'আহ্র সংজ্ঞায় বলেন,**

  ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة النّاس بربّهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا و الآخرة

  আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য আকীদা, ইবাদাত, আখলাক ও লেনদেন এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বান্দাদের সাথে তাদের রবের ও তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি লাভের জন্য যেসব বিধান নির্ধারণ করেছেন তাই শরী'আত।[৫]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খ. ২, পৃ. ৮১৮, ৫০৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৩. ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরাব*, বৈরূত : দারু সাদির, তা.বি., খ. ৮, পৃ. ১৭৪

৪. ড. আব্দুল করীম যায়দান, *আল-মাদখাল লিদ দিরাসাতিশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, আলেকজান্দ্রিয়া : দারু ওমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৬৯ খি, ১৯৬৯, পৃ. ৩৯।

৫. মান্না' আল-কাত্তান, *তারীখুত তাশরীইল ইসলামী*, কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৩-১৪

➢ মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন,

الطريقة المستقيمة التي يفيد منها المتمسكون بها هداية وتوفيقا

শরী'আহ্ হচ্ছে, এক সুদৃঢ় ঋজু পথ, যা দ্বারা তার অবলম্বনকারীরা হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপথ লাভ করতে পারে।[৬]

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কেউ কেউ শরী'আহ্ বলতে যে কোন নবীর শরী'আহকেই বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কেউ শরী'আহকে শুধু সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ স.-এর উপর অবতীর্ণ বিধি-বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। চলমান প্রবন্ধে যেহেতু ইসলামী শরী'আত বলতে সর্বশেষ নবীর শরী'আত উদ্দেশ্য, সেহেতু এখানে শরী'আত বলতে নবী মুহাম্মাদ স.-এর শরী'আতকেই বুঝাবে।

ফিক্হি পরিভাষা হিসেবে মাকাসিদুশ শরীয়াহ্-এর সংজ্ঞা

যে কোন পরিভাষাকে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা যথেষ্ট কঠিন কাজ। তাছাড়া সর্বজনগ্রাহ্য ও সুগঠিত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা ব্যতীত ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ করা ও আলোচনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা আধুনিক যুগে প্রায় অসম্ভব। বর্তমানকালে মাকাসিদুশ শরী'আহকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সে অর্থে কোন সংজ্ঞা পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায় না। এমনকি আবুল মা'আলী আল-জুয়ায়নী [মৃ. ৪৭৮ হি./১০৮৫ খ্রি.], আবূ হামিদ আল-গাযালী [মৃ.৫০৫ হি./১১১১ খ্রি.], আল-ইয্ ইবনু আব্দুস সালাম [মৃ. ৬৬০ হি./১২০৯ খ্রি.], আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আল-কারাফী [মৃ. ৬৮৪ হি./১২৮৫ খ্রি.], শামসুদ্দীন ইবনুল কায়্যিম [মৃ. ৭৪৮ হি./১৩৪৭ খ্রি.], আবূ ইসহাক আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি./ ১৩৮৮ খ্রি.] রহ. প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিত, যারা তাদের রচনাবলিতে মাকাসিদুশ শরী'আহ সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন; তাঁরাও এ বিষয়ের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেননি। বিশেষ করে ইলমুল ফিকহের ইতিহাসে পূর্ববর্তী ফকীহগণের মধ্যে মাকাসিদুশ-শরী'আহর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানকারী দুই জন ফকীহ্ অর্থাৎ ইমাম আল-গাযালী [মৃ. ৫০৫ হি.] ও ইমাম আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০] রহ. এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা সত্ত্বেও কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না দেয়াটা অনেককে অবাক করেছে।[৭]

মূলত উপরোল্লিখিত আলিমগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহে মাকাসিদুশ শরী'আহ্-এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান না করলেও তাঁরা শরী'আহ'র অন্তর্নিহিত লক্ষ্যাবলি বর্ণনা

---

৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ৯

৭. ড. মুহাম্মাদ সা'দ ইবনু আহমাদ ইবনু মাসউদ আল-ইউবী, *মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া 'আলাকতুহা বিল-আদিল্লাতিশ শরঈয়্যাহ*, রিয়াদ : দারুল হিজরাহ লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খি., পৃ. ৩৩

করেছেন কিংবা মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর প্রকারভেদ বা স্তর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম ইমাম আল-গাযালী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-মুসতাসফা ফী ইলমিল উসূল" (المستصفى في علم الأصول)-এ শরী'আহ'র মূল লক্ষ্যসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
>
> সৃষ্টির ব্যাপারে শরী'আতের লক্ষ্য পাঁচটি। সেগুলো হলো, শরী'আহ চায় সৃষ্টির (মানুষের) দীন (ধর্ম), নাফ্স (জীবন/প্রাণ), আক্ল (বুদ্ধি/জ্ঞান), নাস্ল (বংশ) ও মাল (সম্পদ) সংরক্ষণ করতে। যা এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের সংরক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে তা হলো মাসলাহাহ্ (কল্যাণ) এবং যা এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে ধ্বংস বা নষ্ট করে তা হলো মাফসাদা (অকল্যাণ), আর এই অকল্যাণকে দূর করা বা প্রতিহত করাও হলো মাসলাহাহ্।[৮]

ইমাম আল-গাযালী এখানে শরী'আতের মৌলিক পাঁচটি লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন এবং কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণকে শরী'আতের মূল লক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তবে তাঁর বক্তব্য দ্বারা তিনি মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর কোন সূক্ষ্ম সংজ্ঞা প্রদান করেননি। তিনি শুধু শরী'আতের মৌলিক লক্ষ্যকে উপর্যুক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।[৯] তবে কোন কোন গবেষক[১০]-এর মতে, আল-গাযালী তাঁর "শিফাউল গালীল" (شفاء الغليل) গ্রন্থে "মাকাসিদুশ শরী'আহ" এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।[১১]

পরবর্তীতে ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবী রহ., যাকে মাকাসিদুশ শরী'আহ শাস্ত্রের জনক বলা হয়ে থাকে; তিনিও তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-মুয়াফাকাত ফী উসূলিশ শরী'আহ" (الموافقات في أصول الشريعة) -এ মাকাসিদুশ শরী'আহ বিষয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন; কিন্তু এর কোন সংজ্ঞা ঐ গ্রন্থে বা অন্য কোন গ্রন্থে উল্লেখ

---

৮. ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজালী, *আল-মুসতাসফা ফী 'ইলমিল উসূল*, তাহকীক : মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আব্দুশ শাফী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩, পৃ. ১৭৪

৯. ড. মুহাম্মাদ সা'দ ইবনু আহমাদ ইবনু মাসউদ আল-ইউবী, *মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাতি ওয়া 'আলাকতুহা বিল-আদিল্লাতিশ শার'ইয়্যাহ*, রিয়াদ : দারুল হিজরাহ লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযী, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩৩

১০. ইবনু যুবায়গাহ ইয়যুদ্দীন, *আল-মাকাসিদ আল-আম্মাহ লিশ-শরীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, তিউনিসিয়ার আয-যায়তূনাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত থিসিস, ১৪১২ হি., পৃ. ৩৯

১১. ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী, *শিফাউল গালীল ফী বায়ানিশ শিবহি ওয়াল মাখীলি ওয়া মাসালিকিত তা'লীল*, তাহকীক : ড. হাম্দ আল-কুবায়সী, বাগদাদ : মাতবা'আতুল ইরশাদ, ১৩৯০ হি., পৃ. ১৫৯

করেননি। এ বিষয়ে তাঁর এত অবদান সত্ত্বেও তার কোন সংজ্ঞা প্রদান না করার পিছনে কিছু যৌক্তিক কারণ ড. আহমাদ আর-রায়সূনী তার "নাযরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাশ শাতিবী" (نظرية المقاصد عند الشاطبي) গ্রন্থে ও ড. মুহাম্মাদ সা'দ ইবনু আহমাদ ইবনু মাসউদ আল-ইউবী "মাকাসিদুশ শরী'আহ আল-ইসলমিয়্যাহ ওয়া 'আলাকাতুহা বিল আদিল্লাতিশ শারঈয়্যাহ" (مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالادلة الشرعية) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১২]

তবে মাকাসিদ বিষয়ে ইমাম আশ-শাতিবীর দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ পর্যালোচনা করে কেউ কেউ তাঁর নিকট মাকাসিদ-এর সংজ্ঞা কেমন হতে পারে তার একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন, আল-হুসনী-এর "নাযরিয়্যাতু মাকাসিদ ইনদা ইবনি 'আশূর" (نظرية مقاصد عند ابن عاشور) গ্রন্থের সূত্রে মুহাম্মাদ হাসান আলী 'আলূশ তার অভিসন্দর্ভ "আর-রুখসাতু ইনদাল উসূলিয়্যীন ওয়া 'আলাকাতুহা বিমারাতিবি মাকাসিদিশ-শরী'আহ" (الرخصة عند الأصوليين وعلاقتها بمراتب مقاصد الشريعة)-এ লিখেছেন,

> يمكن ان نفهم ان تعريف المقاصد عند الشاطبي هو كل من المعاني المصلحة المقصودة من شرع الاحكام والمعاني الدلالية المقصودة من الخطاب التي تترتب عن تحقيق امتثال المكلف لأوامر الشريعة ونواعيها
>
> আমরা বুঝতে পারি যে, শাতিবীর দৃষ্টিতে মাকাসিদের সংজ্ঞা হলো, বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে সব কল্যাণকর দিকসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়। অনুরূপভাবে শরী'আহর নির্দেশাবলি ও এর বিভিন্ন বিষয় মুকাল্লাফ (আদিষ্ট ব্যক্তি) কর্তৃক প্রতিপালন কার্যকর করার নিমিত্ত যেসব অন্তর্হিত তাৎপর্যসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়।[১৩]

যেহেতু পূর্ববর্তী (المتقدمين) ফকীহগণের গ্রন্থাবলিতে মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না; সেহেতু আমরা পরবর্তী (المتأخرين) ফকীহগণের লিখিত এ বিষয়ক কিংবা উসূলুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে এর সংজ্ঞা অনুসন্ধান করব।

আধুনিককালের গবেষকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কারো কারো সংজ্ঞা সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন ছাড়া প্রায় একই। আবার কেউ দীর্ঘ সংজ্ঞা প্রদান করে বিষয়ের জটিলতা বৃদ্ধি করেছেন। কেউবা তার পূর্বের গবেষকদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলোকে পর্যালোচনা করে নিজে নতুন সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

---

১২. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১৩. মুহাম্মাদ হাসান আলী 'আলূশ, *আর-রুখসাতু ইনদাল উসূলিয়্যীন ওয়া 'আলাকতুহা বিমারাতিবি মাকাসিদিশ শরীয়াহ,* গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর শরী'আহ ওয়াল কানূন কলেজ থেকে উসূলুল ফিকহ বিভাগে ড. মাহির হামিদ আল-হাওলাই-এর তত্ত্বাবধানে কৃত মাস্টার্স-এর অভিসন্দর্ভ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খি., অপ্রকাশিত, পৃ.২৫

মাকাসিদুশ শরী'আহর ওপর লেখা আধুনিক বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধে এর অনেক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

- তিউনিশিয়ার প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আত-তাহির ইবনু আশূর [মৃ. ১৩৯৩ হি.], যাকে আশ-শাতিবী'র পরে এ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রধান পণ্ডিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তিনি প্রথমত মাকাসিদুশ শরী'আহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর পৃথকভাবে প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি "মাকাসিদুশ তাশরী' আল-আম্মাহ" (مقاصد التشريع العامة) (শরী'আহ্ প্রণয়নের ব্যাপক বা সাধারণ উদ্দেশ্য)-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন,

  مقاصد التشريع العامة :هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

  শরী'আহ প্রণয়নের সাধারণ মাকাসিদগুলো হলো সেসব অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও হিকমতসমূহ, যেগুলো শরী'আহ প্রণয়নকারী শরী'আহ প্রণয়নের সর্বাবস্থায় বা অধিকাংশ অবস্থায় বিবেচনায় নিয়ে থাকেন। শরী'আতের কেবল এক জাতীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এগুলোর বিবেচনা সীমাবদ্ধ নয়। এ সংজ্ঞার মধ্যে শরী'আতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে এতে সেসব অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলো শরী'আহ প্রণয়নের সময় বিবেচনায় না এনে পারা যায় না। তদুপরি এতে সেসব হিকমতও অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলো যদিও সব ধরনের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয় না; কিন্তু অনেক ধরনের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে বিবেনায় নেয়া হয়।[১৪]

তবে পরবর্তীতে অনেক সমালোচকই ইবনু আশূর প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে বিভিন্ন কারণে সমালোচনা করেছেন। সেসব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এই সংজ্ঞার মধ্যে দুর্বোধ্য এমন কিছু শব্দের বা পরিভাষার ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো বুঝার জন্য সেগুলোর সংজ্ঞায়ন জরুরী। তাছাড়া তার সংজ্ঞায় সমার্থক শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় এবং সংজ্ঞাটি যথেষ্ট দীর্ঘ; অথচ কোন বিষয়ের সংজ্ঞা সর্বদা সহজবোধ্য, সমার্থক শব্দবিহীন ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১৫]

---

১৪. ইবনু আশূর, *মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ,* মাসনা' আল-কিতাব লিশ-শারিকাতিত তিউনিশিয়াহ, ১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ৫১

১৫. বু আব্দুল্লাহ ইবন আতিয়া, "আকসামুল মাকাসিদ আশ-শরঈয়্যাহ আল-মুকাম্মিলাহ," আল-আকাদামিয়্যাহ লিদ-দিরাসাতিল ইজতিমাঈয়্যাহ ওয়াল ইনসানিয়্যাহ, সংখ্যা-৯, ২০১৩, পৃ. ৯৬-৯৭; মুহাম্মাদ হাসান আলী আলূশ, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬; ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫

- প্রখ্যাত ফকীহ শাইখ আল্লাল আল-ফাসী (মৃ. ১৩৯৪ হি.) তাঁর "মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাকারিমুহা" (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها) গ্রন্থে মাকাসিদুশ শরী'আহ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

মাকাসিদুশ শরী'আহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরী'আতের কোন হুকম প্রণয়নের সময় শরী'আত প্রণেতা যে লক্ষ্য ও গূঢ় তাৎপর্য বা রহস্য সামনে রাখেন তা।[১৬]

এই সংজ্ঞাটিতে মাকাসিদ-এর দুটি প্রকার; যথা সাধারণ ও বিশেষ উভয়কে একত্র করা হয়েছে। সংজ্ঞার (الغاية منها) দ্বারা শরী'আতের লক্ষ্য এবং (الاسرار التي وضعها) দ্বারা শরী'আতের বিধানাবলি প্রণয়নের বিশেষ তাৎপর্য ও রহস্যাবলি বুঝানো হয়েছে।[১৭] এই সংজ্ঞাটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হলেও প্রফেসর বু আব্দুল্লাহ ইবন আতিয়া তার প্রবন্ধে এই সংজ্ঞাটিরও সমালোচনা করেছেন।[১৮]

- ড. আহমাদ আর-রায়সূনী-এর মতে মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর সংজ্ঞা হলো,

إن مقاصد الشريعة: هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

সকল বান্দার উপকারার্থে যেসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে শরী'আহ প্রণয়ন করা হয়েছে তাই হলো মাকাসিদুশ শরী'আহ।[১৯]

- ড. ওহাবাহ আয-যুহায়লী তাঁর "উসূলুল ফিক্হিল ইসলামী" গ্রন্থে মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন,

المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

মাকাসিদুশ শরী'আহ হচ্ছে সেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য; শরী'আহর সকল কিংবা অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রে শরী'আহ-প্রণেতা যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন অথবা শরী'আতের সকল বিধান প্রণয়নের সময় শরী'আহ-প্রণেতা যে লক্ষ্য ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সামনে রেখেছেন তা।[২০]

---

১৬. আল্লাল আল-ফাসী, *মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাকারিমিহা*, রাবাত : মাতবা'আতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৯, খ্রি., পৃ. ৩

১৭. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

১৮. বু আব্দুল্লাহ ইবন আতিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

১৯. ড. আহমাদ আর-রায়সূনী, *নাযরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাশ শাতিবী*, ভার্জেনিয়া, ইউএসএ : দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আই আই আই টি), ১৪১১ হি., পৃ. ৭

২০. ড. ওহাবাহ আয-যুহায়লী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, দামেশ্‌ক : দারুল ফিকর, ১৪০৬ হি., খ. ২, পৃ. ১০১৭

- ড. হুম্মাদী আল-উবায়দী প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো,

ان المقاصد هي الحكم المقصودة للشارع في جميع أحوال التشريع

শরী'আহ আইন প্রণয়নের সকল অবস্থায় শরী'আহ প্রণেতার বাঞ্ছিত গূঢ় তাৎপর্যসমূহকে মাকাসিদ বলে।[২১]

- ড. নূরুদ্দীন আল-খাদিমী মাকাসিদুশ শরী'আহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,

هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حكماً جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين

শরী'আতের মাকাসিদ হলো সে সব অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, যেগুলো শার'ঈ বিধিবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয় এবং বিধিবিধানের সুফল হিসেবে পাওয়া যায়। এ তাৎপর্যসমূহ শরী'আতের ক্ষেত্রবিশেষের জন্য হিকমত হতেও পারে, ব্যাপক জনকল্যাণও হতে পারে অথবা (শরী'আতের) সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যও হতে পারে। আবার এ সব তাৎপর্য একটি মাত্র সাধারণ লক্ষ্যের অধীনেও মিলিত হয়। এ সাধারণ লক্ষ্যটি হলো সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহ ও পরজগতে মানুষের কল্যাণ সাধন করা।[২২]

- ড. ইউসুফ হামিদ আল-আলিম মাকাসিদ-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

مقاصد الشارع من التشريع نعني بها الغاية التي يرمي إليها التشريع، والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام

শরী'আহ প্রণেতার আইন প্রণয়নের মাকাসিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে অভীষ্ট উদ্দেশ্য এবং বিজ্ঞ শরী'আহ প্রণেতা কর্তৃক প্রতিটি বিধি-বিধান প্রণয়নের সময় উদ্দিষ্ট অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও রহস্যসমূহ।[২৩]

- ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী মাকাসিদুশ-শরী'আহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,

هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد

---

২১. ড. হুম্মাদী আল-উবায়দী, *আশ-শাতিবী ওয়া মাকাসিদিশ শরী'আহ*, দামেশক : দারু কুতায়বাহ, ১৪২১/১৯৯২ খ্রি., পৃ. ১১৯

২২. ড. নূরুদ্দীন আল-খাদিমী, *আল-ইজতিহাদুল মাকাসিদী : হুজ্জিয়্যাতুহু, যাওয়াবিতুহু, মাজালাতুহু*, কাতার : সিলসিলাতু কিতাবিল উম্মাহ, সংখ্যা ৬৫, বর্ষ-১৮, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ৫২/৫৩

২৩. ড. ইউসুফ হামিদ আল-আলিম, *আল-মাকাসিদুল আম্মাহ লিশ-শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, ভার্জিনিয়া : আল-মা'হাদুল 'আলামী লিল-ফিকরিল ইসলামী, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খি., দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৮৩

মাকাসিদ হচ্ছে সেই সকল উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও হিকমাত; শরী'আহ প্রণয়নের সময় সকল বান্দার কল্যাণ সাধনের জন্য সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে সেগুলোর প্রতি শরী'আহ-প্রণেতা (আল্লাহ) গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[২৪]

উপর্যুল্লিখিত আলিমগণ ছাড়াও অনেকে মাকাসিদুশ শরী'আহর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন, ইবনুল খূবাহ,[২৫] ইসমাঈল আল-হুসনী/আল-হাসনী,[২৬] ড. মুহাম্মাদ আল-মাদানী বু সাবা,[২৭] ড. মুহাম্মাদ আব্দুল 'আতী মুহাম্মাদ আলী,[২৮] ড. মুহাম্মাদ গিয়াস উদ্দীন হাফিয[২৯] প্রমুখ।

মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর প্রকারভেদ

ইসলামী শরী'আহ-এর প্রতিটি বিধানেরই বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। শরী'আহ-এর এ সকল উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যার প্রতিটির রয়েছে পৃথক পৃথক উপ-বিভাগ।[৩০]

১. মৌলিকত্বের দিক বিবেচনায় মাকাসিদুশ শরী'আহ দুই প্রকার :

ক. মৌলিক উদ্দেশ্য : এ দ্বারা শরী'আহ-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ শরী'আত প্রণেতা কোন নির্দেশ দ্বারা প্রথম যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা বুঝানো হয়েছে। যেমন সালাত আদায়ের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, স্মরণ এবং অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মুক্তি।

খ. সম্পূরক বা আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য : যেসব উদ্দেশ্য মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে অর্জিত হয় বা তার সহায়করূপে উদ্ভূত হয় সেগুলো হচ্ছে সম্পূরক বা আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য। যেমন সালাত আদায়ের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ, ওযুর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা অর্জন ইত্যাদি।

---

২৪. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২৫. ইবনুল খূবাহ, *বায়না ইলমায় উসূলিল ফিকহ ওয়া মাকাসিদিশ শরীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ২১

২৬. ইসমাঈল আল-হাসানী, *নাযরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদা ইবনি আশুর*, পৃ. ১১৯

২৭. ড. মুহাম্মাদ আল-মাদানী বু সাবা, *খতরুল ইরহবি 'আলাল মাকাসিদিল কুল্লিয়্যাহ ফিশ-শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, জামিয়া নায়েফ আল-আরাবিয়্যাতু লিল-উলূমিল আমনিয়্যাহ, রিয়াদ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি., পৃ. ১০

২৮. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল 'আতী মুহাম্মাদ আলী, *আল-মাকাসিদুশ শারঈয়্যাহ ওয়া আছারুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৪২৮ হি./২০০৭ খি., পৃ. ১৯

২৯. মুহাম্মাদ গিয়াস উদ্দীন হাফিয, ইলমু মাকাসিদিশ শরী'আহ : দিরাসাতুন আনিত-তাতাওউরি মিন হায়ছুল ইলমি ওয়াল ফান্নি, *মাজাল্লাতু তুল্লাবি কুল্লিয়্যাতিশ শরী'আহ ওয়াদ দিরাসাতুল ইসলামিয়্যাহ*, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভর্সিটি চিটাগং, ১৪২৩ হি./২০০২ খি., পৃ. ৪৬

৩০. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, ইসলামী শরী'আহ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, *ইসলামী আইন ও বিচার*, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭, বর্ষ-৩, সংখ্যা-৯, পৃ. ১৮-১৯ ; মুহাম্মদ রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

২. ব্যাপকতার বিবেচনায় মাকাসিদুশ শরী'আহ তিন প্রকার :

ক. ব্যাপক বা সাধারণ উদ্দেশ্য : ইসলামী শরী'আহ এর সকল ক্ষেত্রে ও সকল অধ্যায়ে যে সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ব্যাপক উদ্দেশ্য। যেমন,

১. কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি প্রতিহতকরণ,

২. সহজিকরণ ও কঠোরতা বিলোপ ইত্যাদি।

খ. নির্দিষ্ট বা বিশেষ উদ্দেশ্য : শরী'আহ-এর নির্দিষ্ট অধ্যায় ও বিষয়ভিত্তিক যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। যেমন, সালাতের উদ্দেশ্য, সাওমের বা হজ্জের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

গ. ক্ষুদ্র বা গৌণ উদ্দেশ্য : শরী'আহ-এর যে সকল উদ্দেশ্য শুধু কোন একটি নির্দিষ্ট মাস'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় ক্ষুদ্র বা গৌণ উদ্দেশ্য। যেমন, ওযুর সময় নাকে পানি দেয়ার উদ্দেশ্য কিংবা সালাতে রুকু আদায়ের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

৩. মানুষের কল্যাণ সাধনের যে উদ্দেশ্যে শরী'আহ প্রণীত হয়েছে সে বিবেচনায় মাকাসিদুশ শরী'আহ তিন প্রকার :

ক. মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ (আয-যরূরিয়্যাত/ الضروريات);

খ. মানব জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ (আল-হাজিয়্যাত/الحاجيات);

গ. মানব জীবনের সৌন্দর্যবর্ধক বা শোভাবর্ধনকারী বিষয়সমূহ (আত-তাহসীনিয়্যাত/التحسينيات)।[৩১]

হাজিয়্যাত পরিচিতি ও মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি

ইমাম আশ-শাতিবীসহ অন্যান্য ফকীহ মাকাসিদুশ শরী'আহকে মানব কল্যাণের দিক থেকে যে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন অর্থাৎ আয-যরুরিয়্যাত, (অত্যাবশ্যকীয়), আল-হাজিয়্যাত (প্রয়োজনীয়) ও আত-তাহসীনিয়্যাত (সৌন্দর্যবর্ধক), মানবজীবনের সকল কর্মই মূলত এই তিন ভাগের অন্তর্ভুক্ত। মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ পাঁচটি। সেগুলো হলো :

১. দীনের হিফাযাত (حفظ الدين),

২. জীবনের হিফাযাত (حفظ النفس),

৩. আকল বা বিবেকের হিফাযাত (حفظ العقل),

৪. বংশধারার হিফাযাত (حفظ النسل) ও

৫. সম্পদের হিফাযাত (حفظ المال)।[৩২]

---

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. প্রাগুক্ত

এই পাঁচটি বিষয়কে বলা হয় "আল-মাকাসিদ আল-খামসাহ" (المقاصد الخمسة) ; শরী'আহ-এর পাঁচটি উদ্দেশ্য। এগুলো আল-কুল্লিয়াতুল খাম্‌স (الكليات الخمس) নামেও পরিচিত। এগুলোর নিরাপত্তা বা সংরক্ষণ ছাড়া পৃথিবীতে মানবজীবন কোন ভাবেই চলতে পারে না। আর এ জন্যই দীন, জীবন, আকল, বংশধারা ও সম্পদের হিফাযত ইসলামী শরী'আহ-এর একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দীন, তারপর মানুষের জীবন, তারপর তার আকল, বংশধারা এবং সর্বশেষ সম্পদ।[৩৩]

জরুরী বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো দিয়ে মানব জীবনের সকল চাহিদা পূর্ণ হয় না। জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সভ্যভাবে উপভোগ্য করার জন্য মানুষের আরো অনেক কিছু প্রয়োজন। আর এগুলোই হলো মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর দ্বিতীয় প্রকার আল-হাজিয়্যাত বা প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ। এ পর্যায়ে এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ পেশ করা হলো।

- ইমাম আশ-শাতিবী "আল-হাজিয়্যাত"-এর সংজ্ঞায় বলেন,

  هي ما كان مفتقراً إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج، والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل المكلفين على الجملة الحرجُ والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

  হাজিয়্যাত হলো সেই সকল বিষয়, মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্য এবং কঠোরতা, সমস্যা ও অসুবিধা দূরীভূত করার জন্য যা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলোর প্রতি যদি বিশেষ দৃষ্টি না দেয়া হয় তাহলে সাধারণভাবে মানুষের ওপর সমস্যা ও অসুবিধা আরোপিত হয়, তবে তা জনকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিপর্যয় সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না।[৩৪]

- ইমাম আল-গাযালী "আল-হাজিয়্যাত"-এর সংজ্ঞায় বলেন,

  لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح

  যে বিষয়াবলি মানব জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়, বরং মানবজীবনের কল্যাণ অর্জনের জন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি মানবসমাজ মুখাপেক্ষী।[৩৫]

- ইবনু আশূর প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো,

  ما تحتاج إليه الأمة لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام ولكنه يكون على حالة غير منتظمة فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري

---

৩৩. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, *প্রাগুক্ত*

৩৪. ইমাম আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাতু ফী উসূলিল ফিকহ*, তাহকীক : আব্দুল্লাহ দাররাজ, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, খ. ২, পৃ. ১১

৩৫. ইমাম আল-গাজালী, *আল-মুসতাসফা*, প্রাগুক্ত

হাজিয়্যাত হচ্ছে ঐসকল বিষয়, উম্মাহ্র কল্যাণের এবং সুন্দরভাবে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদনের স্বার্থে যে বিষয়গুলোর প্রতি জনগণ মুখাপেক্ষী। যদিও এ বিষয়গুলো সংরক্ষণ না করা হলে সমগ্র ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়বে না, কিন্তু একটি অব্যবস্থাপনার অবস্থা সৃষ্টি হবে। এ জন্যই এটি যরূরিয়্যাতের পর্যায়ভুক্ত নয়।[৩৬]

- মুহাম্মাদ হাশিম কামালী বলেন,
  The hajiyyah are defined as benifits that seek to remove severity and hardship in cases where such severity and hardship do not pose a threat to the very survival of normal order.[37]

- ড. মুহাম্মাদ আব্দুল 'আতি মুহাম্মাদ 'আলী "হাজিয়্যাহ"-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন,

هي الأمور التي يكون الناس في مسيس الحاجة اليها ويقصد بتشريعها رفع الحرج ودفع المشقة عنهم واذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما اذا فقد الضروري ولكن ينالهم الحرج والمشقة

মাকাসিদুল হাজিয়্যাহ হচ্ছে ঐ সমস্ত বিষয় যেগুলোর প্রতি মানুষের প্রয়োজন রয়েছে এবং এর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সমস্যা ও কষ্ট দূর করা, কিন্তু এ বিষয়াবলির অনুপস্থিতিতে মানব জীবনব্যবস্থা ভারসাম্যহীন হয়ে যায় না, যেমনটি হয় যরূরিয়্যাতের অনুপস্থিতিতে। তবে এতে মানুষ কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে।[৩৮]

যরূরিয়্যাত ও হাজিয়্যাত-এর মাঝে আন্তঃসম্পর্ক

মাকাসিদুশ শরী'আহ্র যে তিনটি স্তর রয়েছে (যরূরিয়্যাত, হাজিয়্যাত ও তাহসিনিয়্যাত) সেগুলোর মধ্যে হাজিয়্যাতের সাথে যরূরিয়্যাতের সম্পর্কটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই দু'টি স্তরের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে কোন্‌টি অগ্রাধিকার পাবে, তাও একটি দ্বান্দ্বিক বিষয়। ফকীহগণের মতে, যরূরিয়্যাত হাজিয়্যাতের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে হাজিয়্যাতের ওপর যরূরিয়্যাত অগ্রাধিকার পাবে। ইসলাম কোন কোন ক্ষেত্রে হাজিয়্যাতকে প্রায় যরূরিয়্যাতের মতই গুরুত্ব প্রদান করেছে। এমনকি হাজিয়্যাতের কোন কোন বিষয় নষ্ট হলে তার প্রতিকারে ইসলামী আইন "হদ্দ" (দণ্ডবিধি) বিধিবদ্ধ করেছে। যেমন: ব্যক্তির মানহানী ঘটায় এমন বিষয়াবলি। এ প্রসঙ্গেই বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মাকাসিদ বিশেষজ্ঞ ইবনু আশূর বলেন,

وعناية الشريعة بالحاجي تقرب من عنايتها بالضروري. ولذلك رتبت الحد على تفويت بعض أنواعه كحد القذف

---

৩৬. ইবনু আশুর, প্রাগুক্ত

৩৭. Mohammad Hashim Kamali, Higher Objectives of Islamic Law (Maqasid ash-Sharia) *http://islamicstudies.islammessage.com/ResearchPaper.aspx?aid=478; date of access : 19.12.15*

৩৮. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল 'আতি মুহাম্মাদ 'আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

শরী'আহ্ হাজিয়াত্যের উপর যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে তা প্রায় যরুরিয়্যাতের কাছাকাছি। এজন্যই কিছু কিছু হাজিয়্যাত নষ্ট করার প্রেক্ষিতে শরী'আহ্ "হদ্দ" (দণ্ডবিধি) বিধিবদ্ধ করেছে। যেমন, কাযাফ তথা অপবাদের দণ্ড।[৩৯]

আল-হাজিয়্যাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় পর্যায়ে পড়ে না। সাধারণত এমন হবে না যে হাজিয়্যাতের অভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, জীবন কল্যাণশূন্য হয়ে পড়বে। কিংবা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ বা তার কোন একটিকে নষ্ট করে দেবে। বরং হাজিয়্যাত এমন বিষয় যা অর্জিত না হলে মানব জীবন কষ্ট, অসুবিধা, সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাদের ইবাদাত পালন কঠিন হয়ে যাবে, জীবনের সুনির্মলতার স্থানে কদর্যতা স্থান পাবে। কখন হাজিয়্যাতের অনুপস্থিতি যে কোন ভাবে যরূরিয়্যাত বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।[৪০] এ জন্যই এই পূর্ণাঙ্গ শরী'আহ্ এসেছে, যাতে করে এর মাধ্যমে মানব জীবনের সকল কষ্ট, বাধা, বিপত্তি, কাঠিন্য দূরীভূত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

তিনি (আল্লাহ) দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।[৪১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না।[৪২]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।[৪৩]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে বলা যায়, এই শরী'আতের ভিত্তি সহজতা আনয়ন, কষ্ট নিবারণ ও অসুবিধা দূরীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৪৪] এর ভিত্তিতেই ফকীহগণ ইসলামী আইনের মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন,

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

কষ্ট ও দুর্দশা সহজ বিধানকে নিয়ে আসে।[৪৫]

---

৩৯. আত-তাহির ইবনু আশুর, *মাকাসিদুশ শরী'আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭

৪০. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*

৪১. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮

৪২. আল-কুরআন, ০৫ : ০৬

৪৩. আল-কুরআন, ০২ : ১৮৫

৪৪. বিস্তারিত দ্র. ড. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমায়দ লিখিত রফউল হারজ ফীশ-শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ।

৪৫. ইমাম আস-সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির ফী কাওয়াঈদি ওয়া ফুরু'ইল ফিকহিশ শাফিঈ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি., পৃ. ৭

ইসলামী শরী'আহ-এর সকল ক্ষেত্রে যেমন, ইবাদাত, প্রথা (উরূফ), মু'আমালাত, অপরাধ (দণ্ডবিধি) সকল ক্ষেত্রেই কষ্ট, কঠোরতা ও অসুবিধাকে দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিম্নে কিছু উদাহরণ প্রদত্ত হলো:

ক. আকীদা ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে হাজিয়্যাত

ইসলামের মূল বিষয় হলো আকীদা। আকীদার ক্ষেত্রে জরুরী কিছু বিষয় আছে যেগুলো জানা খুবই জরুরী। আবার কিছু হাজিয়্যাত বা প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। কিছু পরিপূরক বিষয়ও আছে, যা সবার জানা জরুরী নয়। সেগুলো হল আকীদার ক্ষেত্রে তাহসীনী।

ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কষ্টের মুখোমুখী হতে হয়। তাই এই কষ্টকে কমাতে শরী'আত বেশ কিছু ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে। যেমন, মুসাফিরের জন্য সালাত কসর/সংক্ষিপ্ত করার ছাড় দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

> তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।[৪৬]

একইভাবে অসুস্থ ও সফরে থাকা অবস্থায় রমাযানের দিনের সিয়াম পালনে ছাড় দেয়া। আল্লাহ তা'আলা এ ছাড় প্রদান করে বলেন,

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

> তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।[৪৭]

খ. প্রথার ক্ষেত্রে হাজিয়্যাত

আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি জীবন থেকে কষ্ট বা অসুবিধা দূর করার জন্য অনেক খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান, বাহন ইত্যাদি বৈধ করেছেন। তবে এর সবকিছুই হাজিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি প্রধানত তিনটি স্তরের হয় :

১. যা না হলেই নয়, সেগুলো যরুরিয়্যাত ;

২. এমন কোন বিষয় যা বর্জন করলে অসুবিধায় পড়তে হয়, সেগুলো হাজিয়্যাত ;

৩. এমন বিষয় যা বর্জন করলে অসুবিধায় পড়তে হয় না, সেগুলো তাহসিনিয়্যাত।[৪৮]

---

৪৬. আল-কুরআন, ০৪ : ১০১

৪৭. আল-কুরআন, ০২ : ১৮৪

৪৮. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*

প্রখ্যাত মাকাসিদ বিশেষজ্ঞ আল-'ইয্ ইবনু 'আবদুস সালাম এ প্রসঙ্গে বলেন,

> فَالضَّرُورَاتُ : كَالْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلابِسِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَنَاكِحِ وَالْمَرَاكِبِ الْجَوَالِبِ لِلأَقْوَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَمَسُّ إِلَيْهِ الضَّرُورَاتُ ، وَأَقَلُّ الْمُجْزِئِ مِنْ ذَلِكَ ضَرُورِيٌّ ، وَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ فِي أَعْلَا الْمَرَاتِبِ كَالْمَآكِلِ الطَّيِّبَاتِ وَالْمَلابِسِ النَّاعِمَاتِ ، وَالْغُرَفِ الْعَالِيَاتِ ، وَالْقُصُورِ الْوَاسِعَاتِ ، وَالْمَرَاكِبِ النَّفِيسَاتِ وَنِكَاحِ الْحَسْنَاوَاتِ ، وَالسَّرَارِي الْفَائِقَاتِ ، فَهُوَ مِنَ التَّتِمَّاتِ وَالتَّكْمِلاتِ ، وَمَا تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مِنَ الْحَاجَاتِ .
>
> খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, বিবাহ-শাদী, খাদ্য আমদানিকারক যানবাহন ইত্যাদির যতটুকু না হলে জীবন চলে না ন্যূনতম ততটুকু যরুরিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মানের জিনিস যেমন পবিত্র খাদ্য, মসৃণ পোশাক, সুউচ্চ কক্ষ, প্রশস্ত অট্টালিকা, মূল্যবান গাড়ি, সুন্দরী নারী বিবাহ করা, উৎকৃষ্ট দাসী, এসব হলো সম্পূরক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত (অন্য ভাষায় তাহসিনিয়্যাত-এর অন্তর্ভুক্ত)। এই দুই প্রকারের মধ্যবর্তী যা কিছু তাই হাজিয়্যাত।[৪৯]

প্রথার ক্ষেত্রে হাজিয়্যাতের উপস্থিতি যে সকল বিষয়ে পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে খাদ্য-পানীয় অন্যতম। যেসব খাদ্য ও পানীয় শরীরের জন্য ক্ষতিকারক সেসব দ্রব্যাদি শরী'আহ্ হারাম ঘোষণা করেছে। যেমনঃ শূকরের গোশত, মৃত প্রাণী ও রক্ত ইত্যাদি। এসব ক্ষতিকারক পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ বলেছেন,

> ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾
>
> তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং না ফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।[৫০]

এসব পানীয় ও খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ও অপকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে ল্যাবরেটরি টেস্টে প্রমাণিত। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে এসব দ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলে দিয়েছেন এজন্যই যে, এগুলো মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক। আর শরী'আহ্র অন্যতম লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যক্তির জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। যে খাদ্য ও পানীয় দেহ বা মনের জন্য অনিষ্টকর সেগুলো হারাম বা নিষিদ্ধ করে ইসলামী শরী'আহ্ এর লক্ষ্য অর্জনের পক্ষেই কাজ করেছে।

---

[৪৯] আল-'ইয্ ইবনু 'আবদুস সালাম, *কাওয়া'ঈদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম,* বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৬৯

[৫০] আল-কুরআন, ০২ : ১৭৩; আরো দেখুন, আল-কুরআন, ০৫ : ০৩, ১৬ : ১১৫

মানবজীবন সুরক্ষার জন্য একদিকে যেমন কিছু ক্ষতিকারক খাদ্য ও পানীয়কে ইসলামী শরী'আহ্ হারাম করেছে, তেমনি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এমন বহু খাদ্য ও পানীয়কে বৈধ ঘোষণা করেছে। যেমনঃ পবিত্র যে কোন খাদ্য ও পানীয়, শিকার করা প্রাণি ইত্যাদি। মানবদেহের সুরক্ষার জন্য যেগুলো খুবই প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তুসামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদের রুযি হিসেবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্‌র, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর।[৫১]

খাদ্য ও পানীয় ছাড়াও মানবজীবনকে সুরক্ষার জন্য আরো যেসব জিনিস প্রয়োজন, যেমনঃ পোশাক, বাসস্থান, চলাচলের বাহন ইত্যাদির ব্যবস্থা করাও হাজিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। পোশাক পরিধানের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾

হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।[৫২]

বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান[৫৩] করে আল্লাহ বলেন,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন এবং তিনিই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা (তাঁবুর হালকা) ঘর বানাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা সফরকালে তা সহজভাবে (বহন করে) নিতে পারো, আবার কোথাও অবস্থানকালেও (তা ব্যবহার করতে পারো)। ভেড়ার পশম, উটের কেশ ও ছাগলের লোম থেকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমাদের (ঘর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে) ব্যবহারের (উপযোগী) অনেক

---

৫১. আল-কুরআন, ০২ : ১৭২; আরো দেখুন, আল-কুরআন, ০২ : ৫৭, ০৭ : ১৬০, ২০ : ৮১
৫২. আল-কুরআন, ০২ : ১৭২
৫৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. আহমদ আলী, *ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৪

আসবাবপত্র ও সামগ্রী (যেমন বিছানাপত্র, চাদর ও পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি) বানাবার ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।[৫৪]

চলাচলের বাহন হিসেবে পশুকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে আল্লাহ বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর।[৫৫]

এ রকমের বহু বিষয়কে ইসলাম যরুরিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত না করলেও হাজিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। যার অনুপস্থিতিতে জীবন হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে না; কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে সুনিশ্চিত। তাই ইসলামী শরী'আহ্তে হাজিয়্যাতেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

গ. মু'আমালাতের ক্ষেত্রে হাজিয়্যাত

মানবজীবনে পারস্পরিক লেনদেন, আচার-আচরণ ইত্যাদির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অনেক ক্ষেত্রে মু'আমালাতের ওপর ভিত্তি করে মানবজীবন সচল ও স্থিতিশীল থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণ বা উপকার অর্জনের জন্য মু'আমালাতের বিধান জারি করেছেন। কোন কোন বিষয় বা লেনদেন পদ্ধতি শরী'আত হাজিয়্যাতের ভিত্তিতে বৈধ করেছে, যেগুলো নীতিগতভাবে শরী'আতে বৈধ হবার কথা নয়। যেমন, ইজারা, বায় সালাম, মুদারাবা, মুসাকাত ইত্যাদি।[৫৬] এগুলো বৈধ না করা হলে এর থেকেও বড় সমস্যার মুখোমুখী হতে হতো।

যেসব ব্যবসায় পদ্ধতি নীতিগতভাবে শরী'আতে বৈধ নয়; কিন্তু মাকাসিদের আলোকে বৈধতা ঘোষণা করা হয়েছে এমন ব্যবসার মধ্যে অন্যতম হলো বায় সালাম, ইজারা ইত্যাদি। নিম্নে বায় সালাম ও ইজারা কেন মৌলিকভাবে অবৈধ এবং কিভাবে মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে সেগুলো বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা আলোচনা করা হলো।

১. বায় সালাম

বায় সালাম বলতে সাধারণত ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে সরবারহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরী'আহ্ অনুমোদিত পণ্য সামগ্রীর অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝায়।[৫৭] বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ 'আলাউদ্দীন আল-

---

[৫৪] আল-কুরআন, ১৬ : ৮০

[৫৫] আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯; আরো দেখুন, আল-কুরআন, ২৩ : ২১-২২

[৫৬] ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১-৩২৩

[৫৭] আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব, প্রয়োগ ও পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ৬০

কাসানী (মৃ. ৫৮৭) রহ. বায় সালাম যে মূলত বৈধ ব্যবসা পদ্ধতি নয়, এটি মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বৈধ করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে লিখেছেন,

الْقِيَاسَ أَنْ لا يَنْعَقِدَ أَصْلا ، لأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِنْسَانِ

কিয়াস মতে মূলত বায় সালাম বৈধভাবে সংঘটিত হয় না। কারণ, এতে মানুষের কাছে বিদ্যমান নেই এমন পণ্য বিক্রি করা হয়।[৫৮]

কিন্তু এই পদ্ধতির ব্যবসার প্রতি মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এটি বৈধ করা হয়েছে।[৫৯] এই ব্যবসা পদ্ধতিটি কেন বৈধ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ফিক্হ গ্রন্থগুলোতে করা হয়েছে। বিশেষ করে বিখ্যাত ফকীহ ইবনু কুদামা রহ. তার "আল-মুগনী" এবং আর-রামলী তাঁর "নিহায়াতুল মুহতাজ" গ্রন্থদ্বয়ে যে কারণটি উল্লেখ করেছেন তার মূল কথা হলো, যেহেতু সালাম পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি মানুষের প্রয়োজনে রয়েছে এবং পণ্য উৎপাদনকারীরা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক উপাদান ক্রয়ের জন্য অর্থের মুখোমুখি। উৎপাদনে যাওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানও এর মাধ্যমে মেটানো সম্ভব। অপরদিকে ক্রেতাও স্বল্প মূল্যে কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি ক্রয় করতে পারে।[৬০] এ পদ্ধতিতে উৎপাদনকারী এবং অর্থ যোগানদাতা উভয়েই যেহেতু উপকৃত হন, কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হন না সেহেতু চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্য বিদ্যমান না থাকলেও এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলে শরী'আহ্ ঘোষণা করেছে।[৬১]

২. ইজারা

ইজারাও মানবসমাজে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত একটি ব্যবসা পদ্ধতি। ইজারা এমন এক ধরনের চুক্তি যেখানে ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতা- দুটি পক্ষ থাকে। এ পদ্ধতিতে ভাড়া গ্রহীতা সুনির্দিষ্ট প্রতিদান বা ভাড়া প্রদানপূর্বক ভাড়াদাতার মালিকানাধীন সম্পদ থেকে সেবা/সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ এটি একটি ভাড়া চুক্তি যেখানে ভাড়াদাতার মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট সম্পদ স্থিরকৃত মেয়াদে নির্ধারিত ভাড়ায় গ্রহীতার নিকট ভাড়া দেয়া হয়।[৬২] যেমনঃ ঘর, বিল্ডিং, জমি বা কোন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কাউকে ভোগ করতে দেয়া।

---

৫৮. আলাউদ্দীন আবু বাকর আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাঈ' ফী তারতীবিশ শারাঈ'*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪০৬ হি., খ. ১২, পৃ. ২০১

৫৯. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১

৬০. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৮; আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ*, মিসর : মাতবাআতু মুসতাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৮৬ হি., খ. ৪, পৃ. ১৮২

৬১. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১-২২

৬২. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

এই ব্যবসায় পদ্ধতিতে যে বিষয়টির লেনদেন হয় তা হলো "উপকারিতা বা সুবিধা"। যেটি চুক্তি সম্পাদনের সময় বিদ্যমান থাকে না। আর শরী'আহ্তে কোন বৈধ চুক্তির শর্ত হলো, যে পণ্যের চুক্তি করা হচ্ছে তা বিদ্যমান থাকতে হবে। যে বস্তু বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার সময় বিদ্যমান থাকে না তা বিক্রি করা শরী'আহ্র দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কারণ হাকিম ইবনু হিযাম রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

যা তোমার নিকট নেই তা তুমি বিক্রি কর না।[৬৩]

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এর প্রতি মানুষ খুবই মুখাপেক্ষী। কারণ মানুষের বসবাসের জন্য বাড়িঘর কিংবা প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী সবসময় সবার পক্ষে ক্রয় করে ভোগ করা সম্ভব নয়, আবার এমনও কেউ নেই যে, কোন বিনিময় ছাড়াই তাকে বাড়িঘর বা ব্যয়বহুল সামগ্রী ব্যবহার করতে দেবে বা দান করে দেবে। তাই শরী'আহ্ প্রণেতা মানব প্রয়োজনকে বিবেচনা করে ইজারাকে বৈধ ঘোষণা করেছে।[৬৪] এগুলো ছাড়াও ইসলামী শরী'আহ্ মাকাসিদের আলোকে কিরায (মুদারাবা), মুসাকাতসহ বেশকিছু ব্যবসায় পদ্ধতি বৈধ ঘোষণা করেছে।[৬৫] একদিকে যেমন মানব-প্রয়োজন বিবেচনা করে নীতিগতভাবে কিছু অবৈধ ব্যবসায় পদ্ধতিকে বৈধ করেছে, অপরদিকে শরী'আহ্ সুদ, প্রতারণা, তাদলীস, মজুতদারী, অপচয় ও কৃপণতা করা ইত্যাদিকে হারাম ঘোষণা করেছে। যেমনঃ সুদকে হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।[৬৬]

প্রতারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৬৭]

মজুতদারী হারাম ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

---

৬৩. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ : ফির-রাজুলি মা-লাইসা ইনদাহু, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং- ৩৫০৫; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন।

৬৪. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২২-২৩

৬৬. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৫

৬৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : কওলুন-নাবিয়্যি : মান গাশ্শানা ফালইসা মিন্না, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৫৬, হাদীস নং-২৯৪

পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।[৬৮]

খরচের ক্ষেত্রে অপব্যয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।[৬৯]

এভাবেই ইসলামী শরী'আহ্ মানবজীবন থেকে সকল সংকট দূর করে সহজতা আনয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ঘ. অপরাধ বা দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে হাজিয়্যাত

ইসলামী শরী'আহ্ দণ্ডবিধির ক্ষেত্রেও কষ্ট বা অসুবিধা দূর করেছে এবং মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করেছে। যেমন, ভুলক্রমে হত্যার দিয়াতের দায় হত্যাকারীর আকিলার ওপর আরোপ করা হয়েছে। ঐ ব্যক্তির ওপর এই ছাড় দেয়ার উদ্দেশ্য হলো যেহেতু সে ইচ্ছে করে হত্যা করেনি, সেহেতু তার একারই যদি দিয়াত পুরোটা দিতে হতো, তাহলে তা তার জন্য কঠিন হতো। তাই শরী'আত তাকে ছাড় দিয়েছে।[৭০]

উপসংহার

মানব জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্যই শরী'আত। ইসলামী শরী'আহ্ মানবজীবনের কষ্ট ও অসুবিধা দূর করে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাই দীনকে সহজে পালনযোগ্য করেছেন। বর্তমান আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী শরী'আত চায় সকল মানুষ যেন দীনকে সহজে মানতে পারে। তাই শরী'আত প্রণেতা প্রায় সকল ক্ষেত্রে ছাড়ের ব্যবস্থা রেখেছেন। মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলি ও সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়াবলির মধ্যবর্তী প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি মানবজীবনকে আরো সহজ করে দেয়। যার ভিত্তিতে মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের আলোকে সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারবে।

---

৬৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাহ, অনুচ্ছেদ : তাহরীমুল ইহতিকার ফিল-আকওয়াত, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৬, হাদীস নং-৪২০৬

৬৯. আল-কুরআন, ০৬ : ১৪১; আরো দেখুন, আল-কুরআন, ০৭ : ৩১

৭০. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৪

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

ইসলামী আইনে বিধবাদের অধিকার : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এ বিধানে মানবজাতির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে জন্মের পর পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, আবার কারো জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও তার বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। বিবাহিত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে তার স্ত্রী বিধবা হয়ে যায়। আর ইসলামের বিধানানুযায়ী সে স্ত্রীর ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য চলে আসে। আর এ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে, পাশাপাশি সমাজকেও তার অবস্থান পরিস্কার করতে পারে। আর এভাবে সে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি তার অধিকারগুলো আদায় করতে পারে। আর তা না হলে স্বামীহারা এ স্ত্রী তার জীবন, সম্ভ্রম, ভরণ-পোষণ ও তার সম্পদ প্রাপ্তির নিরাপত্তাহীনতায় সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। পরিবার, সমাজ তার কাছে অপরিচিত মনে হতে থাকে, সে সবার করুণার পাত্র হয়ে যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় আইন তাদের অধিকারের নামে যে সকল বিধি-বিধান আরোপ করে, তাতে একজন বিধবা তার স্বকীয়তা হারায়, আর অধিকার থেকে সে হয় বঞ্চিত, তার মর্যাদা হয় ভূলুণ্ঠিত আর সমাজে নেমে আসে বিপর্যয়। যার কারণে সমাজে বৃদ্ধি পায় অপরাধ, মানবসমাজ সংক্রমিত হয় নতুন নতুন মরণ ব্যাধিতে আর বৃদ্ধি পায় হাহাকার ও বঞ্চনা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে সৃষ্টি করার পাশাপাশি তাদের অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যার মাধ্যমে সমাজ থেকে বঞ্চিতদের হাহাকার দূর হবে, বঞ্চিতরা ফিরে পাবে তাদের প্রাপ্য অধিকার, আর সমাজ হয়ে ওঠবে ভারসাম্যপূর্ণ। আর আল্লাহ তাআলা মানবজাতির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। আর বিধবাদের মাধ্যমেও তিনি আমাদের পরীক্ষা করেন। কেননা এর মাধ্যমে একদিকে বিধবা নিজে অসহায়ত্ববোধ করে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অনীহা প্রকাশ করে, আর অপর দিকে সমাজ তার অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে তার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।]

ভূমিকা : জন্মের পর যে বিষয়টি অনিবার্য তা হল মৃত্যু। এই মৃত্যুর মাধ্যমে পুত্র তার পিতা, বোন তার ভাই আর স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়ে থাকে। আর এই হারানোর বেদনা সকলকেই কম-বেশী ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। আর তাই বলে তো জীবন থেমে থাকে না। জীবন হচ্ছে স্রোতের মত, জীবনীশক্তি থাকলে সে চলতেই থাকবে।

---

* সিনিয়র প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

সেই হিসেবে বিভিন্ন বিন্যাসে অগ্রিম জামানত গ্রহণ করা হয়। সমাজে তাকে বিভিন্ন নাম দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন শব্দের প্রকাশ করা হয়। কোথাও বলা হয় সেলামী বা অগ্রিম।[১] আর্থিক জামানতের সকল প্রকার মোটামুটি বৈধ। কেননা, ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো নিষিদ্ধ হওয়া। দলীল পাওয়া গেলেই তা পালন করা যাবে। নতুবা তা বিদ'আত হবে। আর লেনদেনের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো মুবাহ বা বৈধ হওয়া। নিষেধের দলীল পাওয়া গেলেই কেবল সেটি সম্পাদন করা অবৈধ হবে। তবে অনেক সময় আর্থিক জামানতের মাধ্যমে ইজারা নেয়ার পরও ভাড়াটিয়া মালিকের বিভিন্ন ধরনের হয়রানির সম্মুখীন হয়। এ ব্যাপারে ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে বাড়ি-ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে এ সকল প্রকার অনিয়ম থেকে উভয় পক্ষ বিরত থাকতে পারে।

ইজারা পরিচিতি ও শরীয়তে এর বৈধতা

ইজারা শব্দটি আল-আজরু (الأجر) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ পারিশ্রমিক, সম্মানী বিনিময় ও পুরস্কার।

পরিভাষায় ইজারা হলো যে কোনো বস্তুর উপকারিতা বা সুবিধা (utility, advantage) ভাড়ার বিনিময়ে বিক্রি করা।

আলাউদ্দীন আল-কাসানী রহ. (মৃ. ৫৮৭ হি.) বলেন,

الإجارة بيع المنفعة والمنافع للحال معدومة.

ইজারা হলো (যে কোন বস্তুর) সুবিধা ও উপকারিতা বিক্রি করা, যা বর্তমানে বিদ্যমান নেই।[২]

বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী রহ. (মৃ. ৫৯৩ হি.) বলেন,

الإجارة: عقد على المنافع بعوض

ইজারা হলো, বিনিময় দ্বারা (কোন বস্তুর) সুবিধা ও সেবা অর্জনের জন্য চুক্তি করা।[৩]

---

১. উর্দূতে পাগড়ী (پگڑی), ফার্সিতে সারক্বাফলিয়্যা (السرقفلية), আরবীতে কিছু শহরে বাদলাল খুলু (بدل الخلو), কিছু শহরে ফারুগিয়া (الفروغية), আবার কোথাও নকলে কদম (نقل قدم) নামে অভিহিত করা হয়। http://islamqa.info/ar/137290

২. আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাই*, বৈরুত : দারুল কুতবিল ইলমিয়্যা, ১৯৮৬ খ্রি. খ. ৪, পৃ. ১৭৩

৩. বুরহানুদ্দীন আলি ইবনু আবি বকর আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া*, বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাছিল আরবী, তা. বি, খ. ৩, পৃ. ২৩০

শরীয়তে ইজারা বৈধ। নিম্নে এর কয়েকটি প্রমাণ তুলে ধরা হলো:
মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.﴾

আপনি তো ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।[৪]

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَت اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ - قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.﴾

তাদের একজন বললো, হে পিতা! তুমি একে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত কর, কারণ তোমার শ্রমিক হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। তিনি মূসা আ. কে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।[৫]

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত,

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ

নবী স. ও আবু বকর রা. বনী দীলের এক ব্যক্তিকে, (যে পরবর্তীতে বনী আবদ ইব্ন আদীর সদস্য হয়েছিল) ইজারা নিলেন। সে একজন দক্ষ পথ প্রদর্শক ছিল (খিররিত হলো দক্ষ পথ প্রদর্শক)। সে 'আস ইব্ন ওয়ায়িলের বংশের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। সে লোকটি কাফির কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তারা তাকে নিরাপদ মনে করলেন; তাই তারা তাকে তাদের বাহন দু'টি সোপর্দ করলেন ও তাকে তিন রাত পরে সওর পর্বতের দ্বারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অঙ্গীকার নিলেন। সে তাদের নিকট তাদের দুই বাহন নিয়ে তিন রাত পরে ভোরবেলা হাযির হলো। যখন তারা যাত্রা শুরু করলেন। তাদের সাথে আমির ইব্ন ফুহাইরা ও দীল গোত্রের পথ প্রদর্শকও চলল। সে তাদের নিয়ে মক্কার নিম্নভূমি নদীর কিনারা দিয়ে যাত্রা করল।[৬]

---

৪. আল-কুরআন, ১৮ : ৭৭
৫. আল-কুরআন, ২৮ : ২৬-২৭
৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ : ইসতিজারিল মুশরিকীন, কায়রো : দারুশ শু'আব, ১৯৮৭ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ১১৬, হাদীস নং ২২৬৩

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

> قَالَ اللّٰهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.
>
> আল্লাহ বলেন, আমি তিন ব্যক্তির পক্ষে কিয়ামতে বাদী হব। এক ঐ ব্যক্তি যে আমার নাম দিয়ে শপথ করে চুক্তি করেছে, অতঃপর সে তা ভঙ্গ করেছে। আর ঐ ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করেছে, অতঃপর তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। আর ঐ ব্যক্তি যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ করল। তার থেকে সে যথাযথ কাজ নিল কিন্তু তার মজুরী দিল না।[৭]

এ ব্যাপারে আরও অনেক দলীল কুরআন ও সুন্নাহ্য় বিদ্যমান। ফকীহগণ ইজারা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' পোষণ করেছেন।

জামানত পরিচিতি

জামানত শব্দটি মূলত আরবী। এর আভিধানিক অর্থ যিম্মাদারী ও কাফালত গ্রহণ। জামানত-এর সংজ্ঞায় ডক্টর সাদী বলেন,

> ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الاصيل في المطالبة مطلقا: بنفس، أو بدين، أو بعين
>
> সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি বা ঋণ বা কোনো স্বত্বের দাবির ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের পাশাপাশি কফিলের (guarantor) দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা।[৮]

ড. মুহাম্মদ রুয়াস কালা'জী বলেন,

> ضم ذمة إلى ذمة الاصيل في المطالبة ... Guarantee
>
> কোনো দাবির ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তির দায়িত্বের পাশাপাশি অপর কারও দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা। ইংরেজিতে একে গ্যারান্টি বলা হয়।।[৯]

জামানত কয়েক ধরনের রয়েছে। এক. কাফালাত সূত্রে জামানত। যাকে কাফালতও বলা হয়। তা আবার কয়েক ধরনের হতে পারে। ব্যক্তিকে হাযির করার জামানত। যেমন, কেউ বিচারককে বলল, তাকে যামিন দিন, তাকে হাযির করার দায়িত্ব আমি নিলাম বা অর্থের জামানত বা কেউ কারও প্রাপ্য পরিশোধের ব্যাপারে কাফালাত গ্রহণ করা। যেমন বলা হয়, সে তোমার পাওনা না দিলে তুমি আমার নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে বা তোমার পাওনা আদায়ের দায়িত্ব আমি নিলাম। ব্যাংকের এলসির

---

৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : ইছমু মান বায়া হুররান, খ. ৩, পৃ. ১০৮, হাদীস নং ২২২৭

৮. আবু হাবীব সাদী, *আল-কামুসুল ফিকহী*, দামেস্ক : দারুল ফিকর, ১৯৮৮ খ্রি, খ. ১, পৃ. ৩৩২

৯. মুহাম্মদ রুয়াস কালা'জী ও তার সাথী হামেদ, *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, দারুন নাফায়েস, ১৯৮৮ খ্রি. খ. ১, পৃ. ২৮৫

ক্ষেত্রে এই রীতি অনুসৃত হয়। ক্রেতার পক্ষ থেকে ব্যাংক রপ্তানীকারকের পাওনা আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরকম যে কোনো লেনদেনের জন্য জামানত গ্রহণ করা যেতে পারে।

জামানত গ্রহণ শরীয়তে বৈধ। এর কিছু প্রমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:
পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾

যে তা নিয়ে আসতে পারবে তাকে একটি উটের বোঝা পুরস্কার দেওয়া হবে। আমিই তার দায়িত্ব নিলাম।[১০]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّت، فَسَأَلَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَان، قَالَ: صَلُّوا عَلَي صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِه.

নবী স. কোনো ব্যক্তির উপর ঋণ থাকলে তার সালাতুল জানাযা পড়তেন না। একদিন এক মৃতের জানাযা হাযির করা হলো। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার উপর কোনো ঋণ আছে কি? সাহাবীরা বললেন, দুই দীনার ঋণ আছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা তার জানাযা পড়। তখন আবু কাতাদাহ রা. বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই দুই দীনার আদায়ের দায়িত্ব আমি নিলাম। তখন তিনি তার জানাযা পড়িয়ে দিলেন। যখন আল্লাহ তাঁকে বিভিন্ন এলাকায় বিজয় দান করলেন (এবং এর ফলে যুদ্ধলব্ধ মাল আসতে লাগল), তখন তিনি বললেন, আমি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য নিজের সত্তার চেয়েও বড় অভিভাবক। সে যা ঋণ রেখে যাবে তা আমার যিম্মায় থাকবে (আমি বায়তুল মাল থেকে তা আদায় করে দেব)। আর যে সকল সম্পদ সে রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীগণ (মীরাছ হিসেবে) পাবে।[১১]

জামানতের আরেক পদ্ধতি হলো, বন্ধক আকারে জামানত গ্রহণ করা নিজের ঋণ বা যে কোনো হক উসূলের জন্য। তা স্থাবর সম্পত্তিও হতে পারে। আবার অস্থাবর সম্পত্তিও হতে পারে।

বন্ধকের সংজ্ঞা বাহরাইনের শরঈ' স্ট্যান্ডার্ডে এভাবে এসেছে,

الرهن:جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء

---

১০. আল-কুরআন, ১২ : ৭২

১১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল, *আল-মুসনাদ*, বৈরুত : আলমুল কুতুব, ১৯৯৮ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ২৯৬, হাদীস নং ১৪২০৬

বন্ধক হলো, কোনো আর্থিক সম্পদ বা এ জাতীয় বস্তুকে কোনো ঋণের পরিবর্তে আমানত রাখা, যাতে তা থেকে বা তার বিক্রিত মূল্য থেকে অনাদায়ের সময় (ঋণদাতা) তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে।[১২]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী রহ. বলেন,

الرهن لغة: حبس الشيء بأي سبب كان وفي الشريعة: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون، وهو مشروع بقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وبما روي: "أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه" وقد انعقد على ذلك الإجماع

বন্ধক-এর আভিধানিক অর্থ হলো, যে কোনো কারণে কোনো বস্তুকে ধরে রাখা। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে বন্ধক হলো, কোনো বস্তুকে আমানত হিসেবে রাখা কোনো হকের বিপরীতে, যাতে (প্রয়োজনে) বন্ধকী বাস্তু দ্বারা পাওনা পূরণ করতে পারে। যেমন ঋণের পরিবর্তে। এটা বৈধ। কুরআনে এসেছে, "তোমরা কব্জাকৃত বন্ধক গ্রহণ করো।" (আল-কুরআন, ০২ : ২৮৩) হাদীসে এসেছে, নবী স. একজন ইহুদী থেকে খাবার ক্রয় করলেন এবং তার নিকট বর্ম বন্ধক রাখলেন। তাছাড়া বন্ধক রাখা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলিমদের ইজমা রয়েছে।[১৩]

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

নবী স. এক ইহুদী থেকে কিছু খাবার বাকীতে নির্দিষ্ট মেয়াদে ক্রয় করলেন। তখন তার নিকট তিনি লোহার একটি বর্ম বন্ধক রাখলেন।[১৪]

ব্যাংক ঋণ দেয়ার সময় বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জমিজমা বা অন্য কিছুর জামানত গ্রহণ করে থাকে, যাতে প্রয়োজনে ব্যাংক তার প্রাপ্য উসূল করতে পারে। তাও এক প্রকারের বন্ধক।

ইজরায় আর্থিক জামানত গ্রহণ

ঋণ বা হকের কারণে যেমন জামানত গ্রহণ করা হয়, ঠিক তেমনি সম্ভাব্য প্রাপের জন্যও হতে পারে। ইজরাতে সম্ভাব্য পাওনা বা ক্ষতির জন্য আর্থিক জামানত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সম্ভাব্য হকের জন্য জামানত গ্রহণ বৈধ। তার প্রমাণ,

জাবির ইব্‌নু আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

১২. আবদুর রহমান নজদী, *আল-মা'আয়ীরুশ শরী'আহ*, বাহরাইন : হাইয়াতুল মুহাসিবা ওয়াল মুরাজি'য়া, স্টান্ডার্ড নং ৩৯, পৃ. ৫৩১

১৩. বুরহানুদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১২

১৪. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আস-সালাম, পরিচ্ছেদ : আর-রাহ্নু ফিস সালাম, খ. ৩, পৃ. ১১৩, হাদীস নং ২২৫২

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

রাসূলুল্লাহ স. যখন ভাষণ দিতেন তার চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত। তার আওয়াজ উঁচু হত ও রাগ বেড়ে যেত। মনে হয়, তিনি কোনো শত্রু বাহিনী থেকে ভীতি প্রদর্শন করে বলছেন, তারা তোমাদেরকে সকাল বিকাল আক্রমণ করতে পারে এবং তিনি বলতেন, আমি এবং কিয়ামত এই দুই অঙ্গুলের মত কাছাকাছি। তখন তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলি মিলাতেন এবং বলতেন, উত্তম বাণী হলো আল্লাহ্র কিতাব এবং উত্তম জীবনাদর্শ হলো মুহাম্মাদের জীবনাদর্শ। আর নিকৃষ্ট বিষয় হলো যা নব উদ্ভাবিত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রান্ত। অতঃপর বলেন, আমি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য তার নিজের সত্তার চেয়েও ঘনিষ্ঠতর অভিভাবক। সে কোনো সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার পাবে আর কোনো ঋণ বা ইয়াতীম বাচ্চা ও প্রতিবন্ধী রেখে গেলে তা আমার কাঁধে থাকবে (আমি তার খরচ বহন করব)।[১৫]

মিকদাম আল-কিন্দী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন,

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ

আমি প্রত্যেক মু'মিনের ঘনিষ্ঠতম অভিভাবক। তাই কেউ ঋণ বা ইয়াতীম বাচ্চা ও প্রতিবন্ধী রেখে গেলে তা আমার কাঁধে। আর কোনো সম্পদ রেখে গেলে তা তার উত্তরাধিকারীর জন্য। আমি সে ব্যক্তির অভিভাবক, যার কোনো আভিভাবক নেই। আমি তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হব, তার বন্দীমুক্তি করব। আর মামাও অভিভাবক, যার কোনো অভিভাবক নেই। সে তার উত্তরাধিকারী হবে ও তার বন্দীমুক্তি করবে।[১৬]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

১৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আ, পরিচ্ছেদ : তাখফীফিস সালাত ওয়াল খুতবা, বৈরুত : দারুর ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি তা. বি, খ. ২, পৃ. ৫৯২, হাদীস নং ৮৬৭

১৬. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ফারায়েয, পরিচ্ছেদ : ফি মীরাছি যাবীল আরহাম, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ১২৩, হাদীস নং ২৯০০

الْفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

রাসূলের যুগে যখন কোনো মু'মিন মৃত্যুবরণ করত ও তার উপর ঋণ থাকত তখন রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করতেন, তা আদায়ের কি কোনো ব্যবস্থা আছে? যদি তারা বলতেন, হ্যাঁ; তখন তিনি তার জানাযার নামাজ পড়তেন। আর যদি তারা বলতেন না; তখন তিনি সাহাবীদের বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার নামাজ পড়। যখন আল্লাহ্ নবী স. কে বিভিন্ন বিজয় দান করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের সত্তার চেয়েও ঘনিষ্ঠতর অভিভাবক। তাই কেউ মারা গেলে ও ঋণ রেখে গেলে আমি তা আদায় করব আর যে সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীগণ পাবে।[১৭]

ডক্টর ওয়াহাবা আয-যুহাইলী রহ. ইজারায় আর্থিক জামানত গ্রহণের বৈধতার ব্যাপারে বলেন,

للمالك المؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدارا مقطوعا من المال، بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية، إذا تراضيا على ذلك، وقام المؤجر بعدها بتسليم العقار إلى المستأجر، مؤثرا إياه على غيره من المستأجرين. ويعد المأخوذ جزءا معجلا من الأجرة المشروطة في العقد، وتكون الأجور التي تدفع في المستقبل سنويا أو شهريا جزءا آخر من الأجرة مؤجل الوفاء مضافا إلى ما تم تعجيله، مثل اتفاق الزوجين في العصر الحاضر على قسمة المهر إلى معجل ومؤجل، عملا بالعرف العام السائد في البلاد الإسلامية

ইজারাদার মালিকের জন্য সে ইজারাগ্রহীতা থেকে মাসিক বা বাৎসরিক ভাড়া ব্যতীত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংক গ্রহণ করা বৈধ, যদি উভয়পক্ষ তাতে সন্তুষ্ট থাকে। এরপর ইজারাদার যমীনকে ইজারাগ্রহীতাকে হস্তান্তর করবে অন্যান্য ইজারাগ্রহীতার উপর প্রাধান্য দিয়ে। আর তাতে নেওয়া অঙ্ককে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নগদ ভাড়া হিসেবে গণ্য করা হবে। আর পরবর্তীতে মাসিক বা বাৎসরিক যে ভাড়া নেওয়া হবে তাও নগদ ভাড়ার সাথে যোগ হয়ে ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে। যেমন বর্তমানে মোহর দুধরনের হয়ে থাকে নগদ ও বাকী। ইসলামী দেশসমূহে প্রচলনের কারণে তা স্বীকৃত।[১৮]

---

১৭. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আস-সাদাকাত, পরিচ্ছেদ : মান তারাকা দায়নান আও দিয়ায়ান ফা আল্লাহ, ফায়সাল ঈসা বাবী হালাবী, দারু ইহইয়াউল কুতুবিল আরবিয়্যা, তা. বি., খ. ২, পৃ.৮০৭, হাদীস নং ২৪১৫

১৮. ড. ওয়াহবা যুহাইলী, বাদলাল খুলু, *মাজাল্লাতুল মুজাম্মাউল ফিকহিল ইসলামী*, মুনায্‌যামাতুল মু'তামারুল ইসলামী জিদ্দা, সংখ্যা: ১, খ- ৪, পৃ. ১৭৩০; (মাকতাবায়ে শামেলা)

ইজারায় আর্থিক জামানত গ্রহণের বিভিন্ন প্রকার ও তার বিধান

১. স্থায়ী আর্থিক জামানত:

স্থায়ী আর্থিক জামানত হলো ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতিতে জামানত গ্রহণ, যা মোটা অঙ্কের হয়। এ প্রকারের জামানত পদ্ধতি হলো, ইঞ্চি ও ফুট হিসেবে ক্রেতা ভূমির মালিকের কাছ থেকে ভূমি বা দোকান ক্রয় করে নেবে। তাই এ টাকা পরবর্তীতে ক্রেতাকে আর ফেরত দেওয়া হয় না। তবে কিছু ভাড়াও নেওয়া হয়। তখন সেটা ভূমির বা ঘরের ভাড়া হিসেবে নেওয়া হয় না; বরং তা পরিচালনা খরচ (utility charge) বাবদ নেওয়া হয়। এই পদ্ধতির বিক্রি জামানত পদ্ধতিতে বিক্রি নামে পরিচিত। কোথাও একে সেলামী পদ্ধতিতে বিক্রিও বলা হয়। বছরান্তে তাতে চুক্তি মোতাবেক সামান্য ভাড়া বাড়তেও পারে। তা বিভিন্ন সরকারী মার্কেট ও বিভিন্ন ডেভেলপার কোম্পানীর মার্কেটেই বেশি প্রচলিত। তাতে দোকান বরাদ্দও বিভিন্ন লটারির ইত্যাদির মাধ্যমে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে কেউ ক্রয় করলে পরে সে তার হক অপরের কাছেও বিক্রি করতে পারে। তখন তাকেও তার বিক্রেতার চুক্তি ও শর্ত অনুসরণ করতে হয়। তা সরকারীভাবে রেজিস্ট্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়। এ পদ্ধতি ঘর ভাড়ার ক্ষেত্রে তেমন প্রযোজ্য নয়।[১৯]

- শরয়ী বিধান : শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা বৈধ। তা দখলি স্বত্ব ও হক বেচাকেনা হিসেবে গণ্য হয়। আর হক ও অধিকার বিক্রি করা শরীয়তে বৈধ।

দলীল:

বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী রহ. বলেন,

> "وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل" والمسألة تحتمل وجهين: بيع رقبة الطريق والمسيل، وبيع حق المرور والتسييل. فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما، وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء وإن كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق، أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي وعلى الأرض مجهول لجهالة محله. ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي على إحدى الروايتين أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع، أما حق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الأرض فأشبه الأعيان

রাস্তা বিক্রি ও দান করা বৈধ। আর পানি প্রবাহের নালা বিক্রি ও দান করা বৈধ নয়। এই মাসআলাটি দুটি বিষয়কে ধারণ করে। রাস্তা ও পানি চলাচলের স্বত্ব বিক্রি করা। আর অতিক্রম ও পানি প্রবাহের হক বিক্রি করা। যদি প্রথমটি হয় তখন উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো (একটি বৈধ ও অপরটি অবৈধ হওয়ার কারণ), রাস্তা তো নির্দিষ্ট। কেননা, তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্দিষ্ট (তাই তা বৈধ)। আর পানি চলাচলের নালা অজানা। কেননা, নালা কতটুকু পানি ধারণ করে তা জানা যায় না

---

[১৯] সরেজমিনে তদন্ত, (১১/০৬/২০১৫, মহিউদ্দীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, চাক্তাই, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম)

(তাই তা অবৈধ)। আর যদি দ্বিতীয়টি (হকের বিক্রি) হয়, তখন অতিক্রমের হক বিক্রিতে দু'টি মতামত রয়েছে (এক মতে বৈধ, অপর মতে অবৈধ)। তার একটি মত (বৈধতার) ও অতিক্রমের হকের পার্থক্য হলো, অতিক্রমের হক নির্ধারিত (তাই বৈধ)। কেননা, রাস্তা নির্ধারিত। আর উপরিভাগে পানি প্রবাহ তা ছাদে ঘর নির্মাণের হকের মত। তা যমীনে অজানা থাকে তার স্থান অজানা থাকার কারণে। অতিক্রমের হক ও ছাদের উপরের হকের মাঝে পার্থক্য হলো এক বর্ণনা মতে, ছাদের হক এমন বিষয়-সম্পদের (অর্থাৎ ঘরের) সাথে সম্পর্কিত, যা স্থায়ী নয়; তাই তা মুনাফার মত (তাই তা অবৈধ)। অতিক্রমের হক এমন বস্তুর সাথে সম্পর্ক যা স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে তা হলো যমীন, তাই তা স্বত্বের সাথে সাদৃশ্য।[২০]

মুফতী তকী উসমানী বলেন,

هي: حق المرور، حق التعلي، حق التسييل، حق الشرب، حق وضع الخشب على الجدار، وحق فتح الباب. فالمشهور عند الحنفية أن هذه الحقوق حقوق مجردة لا يجوز بيعها، والمعروف في كتب الأئمة الثلاثة جواز الاعتياض عن أكثر هذه الحقوق. وعمدة الخلاف في هذا الباب تعريف البيع، فمن عرف البيع بمبادلة المال بالمال وخص المال بالأعيان، منع بيع الحقوق المجردة، لأنها ليست أعيانا، ومن عمم تعريف البيع بما يشمل المنافع أجاز بيعها. بيع حق المرور عند الحنفية: للحنفية في بيع حق المرور روايتان: إحداهما رواية الزيادات، وهي عدم جواز، والأخرى رواية كتاب القسمة، وهي الجواز.

তা (হক বিক্রির পদ্ধতিসমূহ) অতিক্রমের হক, ছাদে ঘর নির্মাণের হক, পানি প্রবাহের হক, পানি পানের হক, দেওয়ালে লাকড়ি রাখার হক ও দরজা খোলার হক। হানাফীদের নিকট এসকল হক বিক্রি করা বৈধ নয়। আর তিন ইমামের কিতাবে প্রসিদ্ধ মত হলো, এসকল অধিকাংশ হকের বিপরীতে বিনিময় গ্রহণ বৈধ। মতানৈক্যর মূলভিত্তি হলো বাইয়ের সংজ্ঞা। যাঁদের মতে, বায় হলো মালের বিপরীতে মালের বিনিময় করা এবং তাঁরা এ মালকে বিষয়-সম্পদের সাথে সুনির্দিষ্ট করেছেন, তারা এসকল হক বিক্রি নিষেধ করেন। কেননা, এগুলো সম্পদ নয়। আর যারা মালকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন যাতে মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত হয়, তারা তা বিক্রি বৈধ মনে করেন। তাই অতিক্রমের হক বিক্রিতে হানাফীদের নিকট দু'টি বর্ণনা রয়েছে। একটি যিয়াদাতের বর্ণনা। তাতে নিষেধ রয়েছে। আর একটি কিতাবুল কিসমার বর্ণনা। তাতে বৈধ বলা হয়েছে।[২১]

---

২০. বুরহানুদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭

২১. তকী উসমানী, *বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আছিরা,* দামেস্ক : দারুল কলম, ২০০৩ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৯৪

ফাতওয়ায়ে শামীতে এসেছে,

(وصح بيع حق المرور تبعا) للأرض (بلا خلاف)

যাতায়াতের হক বিক্রি যমীনের অনুষঙ্গি হিসেবে বৈধ। এতে কারো দ্বিমত নেই।[২২]

- এ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি খেয়াল রাখতে হবে:

১. উভয় পক্ষের চুক্তিটি স্পষ্টভাবে লিখিত হতে হবে। যাতে মতানৈক্যের সম্ভাবনা না থাকে। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেনদেন করো, তখন লিখে রাখো। উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো লেখক ইনসাফ সহকারে দলিল লিখে দেবে।[২৩]

বর্তমানে দেশীয় চুক্তি আনুযায়ী এ ধরনের লেনদেন ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে নিবন্ধন করে নেওয়া যেতে পারে।

২. অপরকে ভাড়া দিতে চাইলে সে ভাড়া দিতে পারবে। কোম্পানী তাকে বাধা দিতে পারবে না। কেননা, তা বেচা-কেনার মত।

৩. সে তা দখলী মালিকানা অপরকে বিক্রি করতে চাইলে তখনও কোম্পানী তাকে বাধা দিতে পারবে না।

৪. জামানতের টাকা আর ফেরত পাবে না।

৫. সেখানে ক্রেতা কোম্পানীর কোনো শর্ত ভঙ্গ করতে পারবে না। চুক্তির সকল শর্ত মানা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

হে ঈমানদারগণ! অঙ্গীকারগুলো পুরোপরি মেনে চলো।[২৪]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

মুসলিমগণ তাদের পরস্পরের শর্তানুযায়ী কাজ করবে।[২৫]

২. আর্থিক জামানতের দ্বিতীয় পদ্ধতি

বর্তমানে আর্থিক জামানতের আরেকটি পদ্ধতি বহুলভাবে চালু আছে; সেটি হল, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট ভাড়া নেওয়া। তবে সে ক্ষেত্রে ভূমির মালিক জামানত বাবদ নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা গ্রহণ করে। জামানত নেওয়ার পরে ঘরের

---

২২. মুহাম্মদ আমীন ইব্‌ন আবেদীন, *ফাতওয়ায়ে শামী*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯২ খ্রি., খ. ৫, পৃ. ৮০

২৩. আল-কুরআন, ০২ : ২৮২

২৪. আল-কুরআন, ০৫ : ০১

২৫. ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ : আজরুস সামসারাহ, ইমাম বুখারী হাদীসটি তারজামাতুল বাবের অংশরূপে উল্লেখ করেছেন।

ভাড়া বাবদ শর্ত মোতাবেক মাসিক ভাড়া নেওয়া হয়। এ পদ্ধতি দোকান ভাড়াতে বহুল প্রচলিত। বিভিন্ন শিক্ষা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ঘর বা ফ্লাট ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রেও তা প্রচলিত। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য চুক্তি করা হয়। তা হতে পারে পাঁচ বা দশ বছর। মালিকপক্ষ সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তা ফেরত নিতে পারবে না। নতুবা ভাড়াটিয়া ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ভাড়াটিয়াকে সন্তুষ্ট করে ফেরত নেওয়ার অবকাশ রয়েছে। আর্থিক জামানতের এ পদ্ধতি কোথাও কোথাও সেলামী নামে পরিচিত।[২৬]

- **শরয়ী বিধান**

শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ। এক্ষেত্রে অগ্রিম টাকাগুলো আমানত হিসেবে থাকবে। তবে অনুমতি সাপেক্ষে মালিক তা ব্যবহার করতে পারবে। যেমন ব্যাংকের চলতি হিসাবের টাকা আমানত হিসেবে ঋণ ধরা হয়। তাই ব্যাংক তা ব্যবহার করতে পারে। তা এক প্রকার বন্ধকী জামানত। বন্ধকী জামানত স্থাবর সম্পদ যেমন হতে পারে, অস্থাবর সম্পদও হতে পারে।

শরয়ী স্টান্ডার্ডে এসেছে-

> ويجوز رهن ما يجوز شرعا إصداره والتعامل فيه من الأوراق المالية والصكوك مثل الصكوك الإسلامية وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية.
>
> বন্ধক গ্রহণ করা বৈধ এমন বিষয় যা হস্তান্তর করা যায় ও তা দ্বারা লেনদেন করা যায়। তা টাকা হোক বা বন্ড হোক যেমন, ইসলামী বন্ড ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার।[২৭]

ডক্টর ওয়াহাবা আয-যুহাইলী বলেন,

> إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً) فلا مانع شرعاً
>
> যখন কোনো ভাড়াটিয়া মাসিক ভাড়ার অতিরিক্ত এককালীন নির্দিষ্ট অঙ্ক বাড়ির মালিককে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয় শরীয়তে তাতে বাধা নেই।[২৮]

এ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি খেয়াল রাখতে হবে

১. যদি পরবর্তীতে জামানতের টাকা ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে এ পদ্ধতি বৈধ হবে। তবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দিলে তখন কিছু নগদ ও কিছু কিস্তিতে

---

২৬. মালিক ও ভাড়াটিয়ার মাঝে ভাড়া ব্যতীত এককালীন ফেরত বা অফেরতযোগ্য কিছু টাকার লেন-দেনকে সাধারণত সেলামী বলা হয়।

২৭. আবদুর রহমান নজদী, প্রাগুক্ত, স্টান্ডার্ড নং ৩৯, পৃ. ৫৩৬

২৮. ড. ওয়াহবা যুহাইলী, *আল- ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দামেস্ক : দারুল ফিকর, তা বি, খ. ৫, পৃ. ৩৮২৬

ভাড়া আকৃতিতে অফেরতযোগ্য জামানত নেওয়া যেতে পারে। যেমন যুহাইলীর বর্ণনায় এসেছে।

২. মালিককে জামানতের টাকা ব্যবহারের অনুমতি নিতে হবে।

৩. মেয়াদ শেষে ভাড়াটিয়া দোকান বা বাসা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। যদি বহাল থাকতে চায় নতুনভাবে চুক্তি করতে হবে। আর আর্থিক জামানতও ফেরত দিতে হবে।

৪. মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি মালিক ফেরত নিতে চায়, তখন সে তা নিতে পারবে না। তবে ইজারাগ্রহীতা সন্তুষ্টচিত্তে ফেরত দিলে নিতে পারবে। প্রয়োজনে ইজরাগ্রহীতা তার ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে।

৫. ইজরাগ্রহীতা সাবলেট দিতে পারবে।

এই পদ্ধতির আর্থিক জামানতে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি মালিক তার ঘর বা দোকান ফেরত নিতে চাইলে ভাড়াটিয়া মালিকের নিকট কিছু টাকা দাবি করে। যদি মালিক ও ভাড়াটিয়ার মাঝে এমন কোনো চুক্তি বা ওয়াদা না থাকে, "যে এ সময় পর্যন্ত ভাড়া দিলাম বা নিলাম", এমতাবস্থায় মালিক ভাড়াটিয়াকে ছেড়ে দিতে বলতে পারে। এক্ষেত্রে যদি ভাড়াটিয়া মালিকের নিকট কিছু টাকা দাবি করে তখন তা জুলুম ও ঘুষ হবে।

তবে যদি মালিক ও ভাড়াটিয়ার মাঝে নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি থাকে আর মালিক নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই ভাড়াটিয়াকে ঘর বা দোকান ছেড়ে দিতে বলে তখন ভাড়াটিয়ার জন্য ঘর বা দোকান খালি করে দেওয়া আবশ্যক নয়। কেননা, অনেক সময় ভাড়াটিয়াকে ক্ষতি ও ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়। অনেকে তখন ক্ষতিপূরণ নিতে ও দিতে বাধ্য হয়। তখন ভাড়াটিয়ার জন্য তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু টাকা দাবী করা বৈধ হবে। কেননা, সে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ যদি কেউ কোনো হকের মালিক হয় তাহলে সমঝোতার মাধ্যমে কোনো হক ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে কিছু নেওয়া বৈধ। যেমন কিসাসের ক্ষেত্রে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

হে ঈমানদারগণ! হত্যার বিপরীতে তোমাদের জন্যে কিসাস গ্রহণ বিধিবদ্ধ হলো; স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী; কিন্তু যদি কেউ তার ভাই কর্তৃক কোনো বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, তবে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তাগাদা করে এবং সদ্ভাবে তা পরিশোধ করে; এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা; অতঃপর যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।[২৯]

---

২৯. আল-কুরআন, ০২ : ১৭৮

তেমনি কোনো ভাড়াটিয়া যদি সেখানে কোনো মেরামত বা সংস্কারমূলক কাজ করে তখন তার পরিবর্তে সে বের হয়ে যাওয়ার সময় মালিক থেকে কিছু নিতে পারে।

এ ব্যাপারে ডক্টর ওয়াহবা আয-যুহাইলী বলেন,

> "ইজারাগ্রহীতা হক হস্তান্তরে ক্ষতিপূরণ নামে ইজারাদার মালিক থেকে চুক্তির মেয়াদের ভেতরে ইজারা বাতিলের জন্য ও ইজারাদারকে তার বস্তু ফেরত দেওয়ার জন্য যে অর্থ নেয় তা জুমহুরের নিকট হারাম। তবে ইমাম মালিক ও আবু ইউসুফের মত ভিন্ন। কেননা, আর্থিক চুক্তি বা লেনদেন যেমন বেচাকেনা ও ইজারা বাতিল করা ইকালার অন্তর্ভুক্ত। তা আবু হানীফার মতে, পূর্ব মূল্যের উপর হতে হবে, বেশকম হতে পারবে না। কেননা, তা উভয়পক্ষের জন্য ফেরত নেওয়া ও তৃতীয় ব্যক্তির জন্য নতুন লেনদেন। তাই বেচাকেনা ও ইজারা বাতিল প্রথম মূল্য দিয়ে হতে হবে। বেশকম, সময়ের বা অন্য কোনো বিনিময়ের চুক্তি বাতিল হবে। ফেরত নেওয়াটা দখলের পূর্বে হোক বা পরে হোক। কেননা, ফেরত নেওয়া হলো উভয়ের জন্য চুক্তি বাতিল। আর চুক্তি বাতিল হলো প্রথম চুক্তিকে উঠিয়ে দেওয়া। আর চুক্তি তো হয়েছে প্রথম বিনিময়ে তা বাতিলও সেই বিনিময়ে হবে। আর অগ্রহণযোগ্য শর্তারোপ বর্জনীয় বিবেচিত হবে। তাই যদি প্রথম চুক্তির অতিরিক্ত ও কমের উপর কোনো চুক্তি হলে তা আবশ্যিক হবে না। একই মত হলো ইমাম যুফারের। তাঁর মতে, ফেরত নেওয়া সকলের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হিসেবে গণ্য। একই মত ইমাম মুহাম্মাদের, যিনি প্রয়োজন ব্যতীত ফেরত নেওয়াকে চুক্তি বাতিল হিসেবে গণ্য করেন। আর প্রয়োজনে তিনি এটিকে নতুন লেনদেন হিসেবে গণ্য করেন। তাই শাফিয়ী ও হাম্বালীদের মতে, যারা ফেরত নেওয়াকে চুক্তি বাতিল হিসেবে গণ্য করে তাতে বেশকম কর যাবে না। কিন্তু ইমাম মালিক রহ. ফেরত নেওয়াকে নতুন লেনদেন হিসেবে গণ্য করেন। তাই তাতে বেশকম করা বৈধ বলেন। তা-ই ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত। তিনি ফেরত নেওয়াকে নতুন লেনদেন মনে করেন, যদি তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। তাদের মতে, ইজারাদার মালিক ইজারাগ্রহীতাকে অতিরিক্ত দিতে পারে ইজারা বাতিলের ক্ষেত্রে ও ইজারাবস্তু হস্তান্তরের ক্ষেত্রে। যদি কোনো ইজারাদার ইজরার মেয়াদ শেষ হলে ইজারাগ্রহীতাকে কিছু মাল হাদিয়া দেয়, ইজরাগ্রহীতা চলে যায়। তা সকলের নিকট বৈধ। কেননা, দান করা নফল কাজ যা পরস্পর সন্তুষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।"[৩০]

---

[৩০] ড. ওয়াহবা আয-যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৩০

أن ما يأخذه المستأجر من بدل الخلو من المالك المؤجر لفسخ عقد الإيجار، ضمن مدة العقد، وتسليمه المأجور لصاحبه يعد كسبا حراما غير مباح شرعا في رأي الجمهور غير المالكية وأبي يوسف؛ لأن إقالة عقود

৩. আর্থিক জামানতের তৃতীয় পদ্ধতি

মালিক পক্ষ ভাড়াটিয়া থেকে মোটা অঙ্কের টাকা জামানত বাবদ নেয়। সাথে সাথে ভাড়াটিয়া থেকে ভাড়াও গ্রহণ করে। আবার সেখানে জামানত থেকে মাসিক কিছু টাকা ভাড়া হিসেবে কেটে নেওয়া হয়।

- শরয়ী বিধান : শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা বৈধ। এ অবস্থায় জামানতগুলো অগ্রিম ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে।

এ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি খেয়াল রাখতে হবে:

১. অগ্রিম জামানত যদি ভাড়া কর্তনে শেষ হয়ে যায়, তাহলে নতুন চুক্তি করতে হবে।
২. দোকান বা বাসায় কোনো ক্ষতি হলে তখন তা আর্থিক জামানত থেকে কেটে নেওয়া হবে।
৩. উভয়পক্ষ চুক্তি পালনে বদ্ধ পরিকর হতে হবে।

৪. আর্থিক জামানত গ্রহণের চতুর্থ পদ্ধতি

ইজারাগ্রহীতা অপরকে ভাড়া দিয়ে আর্থিক জামানত গ্রহণ করা। যা সাবলেট নামে পরিচিত। তাও বৈধ, যদি তা চুক্তির মেয়াদের ভেতরে হয়। তবে সেক্ষেত্রে বাড়ির

المعاوضات المالية أو فسخها، كالبيع والإيجار، لا تجوز إلا بنفس العوض الذي تم التعاقد عليه في رأي الإمام أبي حنيفة الذي جعل الإقالة فسخا في حق العاقدين، بيعا جديدا في حق شخص ثالث غيرهما.

ومقتضى هذا الرأي أن الإقالة للبيع ومثله الإيجار، تصح بالثمن الأول، ويبطل ما شرطه المتعاقدان من الزيادة أو النقص أو الأجل، أو الجنس الآخر من الأعواض، سواء أكانت الإقالة قبل القبض أم بعده؛ لأن الإقالة فسخ في حق العاقدين، والفسخ رفع العقد والعقد وقع بالعوض الأول، فيكون فسخه بالعوض الأول، ويبطل الشرط الفاسد، فإذا تقايل العاقدان على أكثر من العوض الأول أو أقل على جنس آخر، يلزم العوض الأول لا غير.

وهذا هو الحكم أيضا على قول زفر الذي يجعل الإقالة في رأيه فسخا في حق الناس كافة وهو أيضا قول محمد الذي يجعل الإقالة فسخا إلا إذا تعذر ذلك للضرورة، فتجعل بيعا.

وكذلك قال الشافعية والحنابلة، الذين قرروا بطلان الإقالة في هذه الحالات بسبب الشرط الفاسد في البيع ونحوه، فلا تجوز عندهم الزيادة ولا النقصان.

أما الإمام مالك فيرى أن الإقالة بيع جديد، فيجوز فيها الزيادة أو النقصان وهو أيضا قول أبي يوسف الذي يجعل الإقالة بيعا جديدا في حق العاقدين وغيرهما، إلا أن يتعذر جعلها بيعا، فتجعل فسخا وبناء على هذا الرأي يصح للمالك المؤجر دفع زيادة عن الأجرة المقبوضة إلى المستأجر الذي دفعها، نظير فسخ الإجارة وتسليم المأجور.

وأما إذا وهب المؤجر باختياره ورضاه بعد انتهاء الإجارة من المال للمستأجر، يسميه الناس الآن (مقابل الخلو) لأجل إخراج المستأجر من المأجور، فهو أمر جائز باتفاق العلماء؛ لأن الهبة تبرع، وقد تم الدفع بالتراضي.

মালিক থেকে অনুমতি নিতে হবে। তবে যে মূল্যে ভাড়া নিয়েছে তার চেয়ে বেশি দিয়ে ভাড়া দেওয়া বৈধ হবে কি না তাতে আলিমদের মতবিরোধ দেখা যায়। কারও কারও মতে, তা বৈধ নয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন- ইব্‌ন উমর, ইবরাহীম নখয়ী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, ইব্‌ন সীরীন প্রমুখ।[৩১] বরং তাদের কারও মতে অতিরিক্ত টাকা মালিককে ফেরত দিবে।

আবার অনেকের মতে, অপরকে অতিরিক্তের সাথে ভাড়া দেওয়া বৈধ। কেননা, তা বেচাকেনার মত। হাসান বসরী, তাউস ও হাকাম প্রমুখ তা পোষণ করেন।[৩২] বর্তমানে এটিই অগ্রগণ্য মত।[৩৩]

মাজাল্লাতুল মুজাম্মা'ইল ফিকহিল ইসলামীতে এসেছে,

وهي ما يأخذه المستأجر من بدل الخلو من شخص آخر غير المالك المؤجر، مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة العقار، ليحل محله ذلك الشخص في الانتفاع بالعقار.هذه الحالة جائزة أيضا بشرط أن يكون التنازل ضمن مدة عقد الإجارة. فإذا كانت المدة سنة، أمضى المستأجر في العقار مدة ستة أشهر منها مثلا، جاز له التنازل لشخص آخر للانتفاع بالمأجور بقية للمدة المتفق عليها بين المالك والمستأجر.

তা হলো, ইজারাগ্রহীতা ইজারাদার মালিক ব্যতীত অপর থেকে সেলামী গ্রহণ করা। তাকে ভাড়া দিয়ে যাতে যমীন থেকে সে ফায়দা হাসিল করে তাও বৈধ, যদি ভাড়া দেওয়াটা তার চুক্তির ভেতরে থাকে। যদি চুক্তির মেয়াদ এক বছর হয় ইজরাগ্রহীতা ছয় মাস ব্যবহার করল তখন মালিকের চুক্তি মোতাবেক বাকী ছয়মাস অপরকে দিতে পারবে।[৩৪]

---

[৩১] ইব্‌ন আবী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, বোম্বাই : তাবআতুত দারুস সালাফিয়্যা, তা. বি, হাদীস নং ২৩৭৪৬, ২৩৭৪৮, ২৩৭৬০, ২৩৭৫৮

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَآجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، قَالَ الْفَضْلُ لِلأَوَّلِ.

[৩২] ইব্‌ন আবী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, হাদীস নং ২৩৭৬৪; ২৩৭৬৫; ২৩৭৬৮; ২৩৭৬৭

عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إِبِلاً فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ : فَتَرَدَّدَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ : مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فِي رَأْيِي.

عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا اكْتَرَيْتَ بَيْتًا أَنْ تُكْرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ.

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ.

عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ : إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا، قَالَ : لاَ بَأْسَ.

[৩৩] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, ড. আহমদ আলী রচিত ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৫, পৃ. ১০৭-১০৯

[৩৪] ড. ওয়াহবা আয়-যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৩০

৫. আর্থিক জামানত গ্রহণের পঞ্চম পদ্ধতি

এ্যাডভান্স (Advance) পদ্ধতি ২ প্রকার :

সিকিউরিটি এ্যাডভান্স (Security Advance) (নিরাপত্তা অগ্রিম) : এ পদ্ধতিতে ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট ভাড়া দেওয়ার সময় কিছু টাকা অগ্রিম নিয়ে নেওয়া হয়। তবে পরে টাকাগুলো আবার ফেরত দেওয়া হয়। এ টাকা থেকে ভাড়া কর্তন করা হয় না। মালিক ভাড়াটিয়া থেকে এককালীন টাকা নেওয়ার কারণ হলো, যদি ভাড়াটিয়া কোনো কারণবশত ভাড়া না দিয়ে চলে যায়, তাহলে উক্ত টাকা থেকে ভাড়া কেটে নেওয়া হবে। অনুরূপভাবে যদি ভাড়াটিয়া ঘর বা দোকানের কোনো ক্ষতি করে তাহলে উক্ত টাকা দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। তা সাধারণত মোটা অঙ্কের হয় না। এক-দুই মাসের ভাড়ার পরিমাণ নেওয়া হয়। ঘর ভাড়ার ও দোকানের উপভাড়ার ক্ষেত্রে তার প্রচলন বেশি দেখা যায়।

- **শরয়ী বিধান**

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতি বৈধ। এ পদ্ধতিতে ভূমির মালিকের কাছে টাকাগুলো আমানত হিসেবে থাকবে। মালিক নিজের প্রয়োজনে খরচ করতে চাইলে টাকার মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এ টাকা ভূমি, বাড়ি-ঘর বা দোকান-পাটের নিরাপত্তার জন্য নেওয়া হয়। যাতে শর্ত ভঙ্গ করলে, কোনো আসবাব-পত্র নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ নিতে পারে। ঘর ভাড়ার ক্ষেত্রে এর প্রচলন বেশি দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে মালিকের অনুমতি ব্যতীত দোকান বা বাড়ি যে কাজের জন্য নিয়েছে তা ছাড়া ভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যদি করে তখন মালিক তাকে উচ্ছেদ করতে পারবে।

বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এর ১৮ (ঘ) নং ধারা মতেও বাড়ির মালিককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। এ ধারা মতে, ভাড়াটিয়া বাড়ির কোনো অংশ যদি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন বা ব্যবহার করতে অনুমতি দেন, তা হলে বাড়ির মালিক তাকে উঠিয়ে নিজের দখল পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

৬. আর্থিক জামানত গ্রহণের ষষ্ঠ পদ্ধতি

Cutable Advance (কর্তনযোগ্য অগ্রিম) : এ পদ্ধতিতেও ভাড়া দেওয়ার সময় সামান্য কিছু টাকা অগ্রিম নিয়ে নেওয়া হয়। পরে টাকাগুলো আবার ফেরত দেওয়া

এডভান্স পদ্ধতি হলো, জমি কিংবা ঘর কোনটাই বিক্রয় না করে মালিক ও ভাড়াটিয়ার মাঝে ফেরত বা কর্তনযোগ্য কিছু টাকার লেনদেনকে এডভান্স বলা হয়। এডভান্স ও প্রচলিত সেলামীর পার্থক্য হলো,

এডভান্স কম হয়। দুই-এক মাসের ভাড়ার পরিমাণ জামানত নেওয়া হয়। আর সেলামী বেশি নেওয়া হয়। তা কয়েক লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

হয়। তবে এ টাকা থেকে কিছু কিছু ভাড়া কর্তন করা হয়। যেমন, মাসিক ভাড়া বার হাজার টাকা হলে ভাড়াটিয়া দশ হাজার টাকা আদায় করে বাকী দুই হাজার টাকা উক্ত এককালীন থেকে কর্তন করা হয়।

- **শরয়ী বিধান**

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতিও বৈধ। এক্ষেত্রে এডভান্সের টাকা অগ্রিম ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু অগ্রিম ভাড়া আদায় করা সহীহ; তাই এডভান্সের এ পদ্ধতিও সহীহ। এখানে টাকাগুলো ভূমির মালিকের কাছে আমানত হিসেবে থাকবে না। মালিক চাইলে এ টাকা নিজের প্রয়োজনেও খরচ করতে পারবে। বাসা, বাড়ি, অফিস ইত্যাদি ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়।

তা বৈধ হওয়ার দলীল:

আবুল হাসান সুগদী (মৃ. ৪৬১ হি.) বলেন,

والاجرة على اربعة أوجه اما ان تكون مُعجلَة أو مُؤَجّلَة أو منجمة أو مسكوتا عَنْهَا

মজুরী চার প্রকার। তা হয়ত নগদ হবে বা বাকী হবে বা কিস্তিতে হবে বা তা থেকে নিশ্চুপ থাকবে।[৩৬]

ইব্‌ন নুজাইম মিসরি (মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন,

وَلَوْ قَدَّمَ أُجْرَةَ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ وَقَبَضَ الْمُعَجَّلَ يَوْمًا لا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ فِيمَا عُجِّلَ؛ لأَنَّ بِالتَّقْدِيمِ زَالَتْ الْجَهَالَةُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَصَارَ كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ

---

২. এডভান্সের কারণে ভাড়ায় কম নেওয়া হয় না। কিন্তু সেলামীর কারণে ভাড়া কম নেয়া হয়।

৩. এডভান্সের ক্ষেত্রে ঘর বা দোকান ভাড়ার দীর্ঘ মেয়াদ থাকে না। সেলামীর ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি থাকে। তাই কোনো মালিক এডভান্সের ক্ষেত্রে দুই-তিন মাস আগে নোটিশ দিয়ে ঘর বা দোকান ছাড় করতে পারে। কিন্তু সেলামীর ক্ষেত্রে চুক্তি শেষ হওয়ার পূর্বে তা করতে পারে না। চুক্তি শেষ হলেই নতুনভাবে থাকা না থাকার ব্যাপারে চুক্তি নবায়ন কিংবা বাতিল করা হয়।

৪. ঘর ভাড়ার ক্ষেত্রে এডভান্স পদ্ধতিই বেশি চালু। তবে কোনো শিক্ষা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো বাসা ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে সেলামী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। আর দোকান ভাড়ার ক্ষেত্রে সেলামীর উভয় পদ্ধতি তথা ক্রয়পদ্ধতির সেলামী ও ফেরতযোগ্য মোটা অঙ্কের সেলামী বহুল প্রচলিত। মাঝে মধ্যে এডভান্সের সিস্টেমও দেখা যায়।

৫. সেলামীর ক্ষেত্রে উপভাড়া তথা ভাড়াটিয়া অপরকে ভাড়া দিতে পারে যা সাবলেট হিসেবে পরিচিত। এডভান্সের ক্ষেত্রে তার সুযোগ থাকে না; তবে মাঝে মধ্যে কাউকে শরীক করে একাংশ ভাড়া দিতে পারে।

[৩৬] আবুল হাসান সুগদী, *আন-নিতাফ ফিল ফতাওয়া*, বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৪ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৫৬৩

যদি এক মাস বা তার চেয়ে বেশির ভাড়া অগ্রিম আদায় করে আর নগদ তা গ্রহণ করে, তখন তা বাতিল করার সুযোগ থাকবে না। কেননা তা নগদ দেওয়াতে সন্দেহ দূরীভূত হয়। তাই তা চুক্তিতে শর্তারোপের মত।[৩৭]

আবদুর রহমান আফিন্দি (মৃ. ১০৭৮ হি.) বলেন,

وَلَوْ قَدَّمَ أُجْرَةَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ وَقَبَضَ الأُجْرَةَ لا يَكُونُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ فِيمَا عَجَّلَ

যদি ইজারাগ্রহীতা দুইমাস বা তিনমাসের ভাড়া অগ্রিম আদায় করে আর মালিক গ্রহণ করে, তখন তাদের কারও তা বাতিল করার সুযোগ থাকে না।[৩৮]

আল্লামা যায়লায়ী (মৃ.৭৪৩ হি.) বলেন,

وَلَوْ قَدَّمَ أُجْرَةَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَة وَقَبَضَ الأُجْرَةَ فَلا يَكُونُ لِوَاحد مِنْهُمَا الْفَسْخُ فِي قَدْرِ الْمُعَجَّلِ أُجْرَتُهُ؛ لأَنَّهُ بِالتَّقْدِيمِ زَالَتْ الْجَهَالَةُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَيَكُونُ كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ

যদি দুইমাস বা তিনমাসের ভাড়া অগ্রিম আদায় করে আর তা কব্জা করে নেয়। অগ্রিম নগদ পরিশোধের ক্ষেত্রে তাদের কারও তা বাতিল করার সুযোগ থাকে না। কেননা অগ্রিম আদায় করার কারণে পরিশোধের পরিমাণে অজ্ঞতা থাকেনা; তাই তা চুক্তিতে নির্দিষ্ট করার মত।[৩৯]

ফাতওয়ায়ে আলমগিরীতে বলা হয়েছে,

وَلَوْ قَدَّمَ أُجْرَةَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ وَقَبَضَ الأُجْرَةَ فَلا يَكُونُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ فِي قَدْرِ الْمُعَجَّلِ أُجْرَتُهُ،

যদি দুই মাস বা তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম আদায় করে আর ভাড়া গ্রহণ করে নেয় তখন কারও সেই নগদ ক্ষেত্রে তা বাতিল করার সুযোগ থাকে না।[৪০]

৭. আর্থিক জামানত গ্রহণের সপ্তম পদ্ধতি

No Back Advance (অফেরতযোগ্য অগ্রিম) অর্থাৎ মালিক ভাড়াটিয়া থেকে কিছু টাকা ভাড়া ব্যতীত অগ্রিম নেবে, যা আর ফেরত দেবে না।

---

৩৭. ইবন নুজাইম মিসরী, *বাহরুর রায়েক*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল ইসলামী, তা. বি., খ. ৮, পৃ. ২০

৩৮. আবদুর রহমান আফিন্দি, *মাজমাউল আনহুর*, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৩৮২

৩৯. উসমান ইব্‌ন আলি যায়লায়ী, *তাবয়ীনুল হাকাইক*, কায়রো : আল-মাতবা'আতুল কুবরা, ১৩১৩ হি., খ. ৫, পৃ. ১২৩

৪০. নিজামুদ্দীন বলখী প্রমুখ, *আল-ফতাওয়া আল-হিন্দিয়া*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪১০ হি., খ. ৪, পৃ. ৪১৬

- শরয়ী বিধান : শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা অবৈধ। এটা মূলত পজিশন বিক্রি। তা বৈধ নয়।[৪১]

উপসংহার

দোকান ও ঘর ভাড়ার ক্ষেত্রে আর্থিক জামানত ও এডভান্স গ্রহণের পদ্ধতি নতুন উদ্ভাবিত হলেও তা প্রয়োজন, প্রচলন ও লেনদেনের মূলনীতির আলোকে বৈধ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তা বিদ্যামান না থাকলেও তার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কেননা, তা মূলত এক প্রকার জামানত। আর শরীয়তে জামানত বৈধ। রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগেও জামানত প্রথা চালু ছিল। রাসূলুল্লাহ স. নিজেই মৃত ব্যক্তির ঋণের জামানত গ্রহণ করেছেন। তা তিনি বায়তুল মালে অর্জিত মালে ফাই তথা যুদ্ধবিহীন অর্জিত সম্পদ থেকে আদায় করতেন। তবে সকল প্রকার আর্থিক জামানত ও এডভান্স গ্রহণের ক্ষেত্রে স্পষ্ট চুক্তি হওয়া জরুরী। যাতে পরবর্তী সময়ে তাতে কোনো ধরনের জটিলতা তৈরী না হয়। আর কোনো পক্ষের সীমালঙ্ঘনের সময় লিখিত চুক্তি দেখে তার সমাধান করে নিতে পারে।

---

৪১. আবদুল্লাহ নজীব প্রমুখ, *দারুল ফিকহ*, হাটহাজারী : ফতওয়া বিভাগ হাটহাজারী, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৩০৫

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

ইজারায় আর্থিক জামানত পদ্ধতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

হুমায়ুন কবির*

[সারসংক্ষেপ : *ইরাজায় জামানতের একটি ধরন হলো আর্থিক জামানত (financial security)। এ পদ্ধতিটি দোকান, গুদাম, অফিস, ফ্যাক্টরি ও বাসা-বাড়ি ইত্যাদি ইজারার ক্ষেত্রে সমাজে বহুল প্রচলিত। সাধারণত ইজারা নেওয়ার সময় ভাড়াটিয়াকে দোকান বা ভূমির মালিকের নিকট অগ্রিম হিসেবে নগদ অর্থ দিতে হয়। জামানত হিসেবে নগদ অগ্রিম অর্থ নেয়ার বিষয়টি পূর্বযুগে তেমন চালু ছিল না। গত শতাব্দীতে তা বহুল প্রচলন লাভ করেছে। আর্থিক জামানত কখনও মোটা অংকের হয়ে থাকে। আবার কখনও কম অংকের হয়ে থাকে, যা দুই-এক মাসের ভাড়ার পরিমাণ হতে পারে। ইজারা দেওয়া যেমন শরীয়তে বৈধ, তেমনি আর্থিক জামানত গ্রহণ করাও শরীয়তে বৈধ। জামানতের অর্থ আমানত হিসেবে থাকে। চুক্তিমতে পরে তা ফেরত দেয়া হয়। তবে অনেক সময় অফেরতযোগ্য মোটা অঙ্কের আর্থিক জামানতও গ্রহণ করা হয়, যা আসলে দখলি স্বত্বের বেচাকেনা হিসেবে গণ্য হয়। তাও শরীয়তে বৈধ। বিভিন্ন সরকারী মার্কেট ইত্যাদিতে এর প্রচলন দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় উভয় পক্ষের চুক্তিটি কাগজে স্পষ্টভাবে লিখিত হতে হবে। যাতে মতানৈক্যের সম্ভাবনা না থাকে। ইজারাগ্রহীতা অপরকে ভাড়া দিয়েও আর্থিক জামানত গ্রহণ করতে পারে। তাও শর্ত সাপেক্ষে বৈধ। কখনো মালিক ভাড়াটিয়া থেকে কিছু টাকা ভাড়া ব্যতীত অগ্রিম নেয়, যা আর ফেরত দেয় না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা অবৈধ। যা মূলত পজিশন বিক্রি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আর্থিক জামানতের বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধান করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এর সমাধান বের করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে এ ব্যাপারে মানুষের সংশয় দূর হয়ে যায়।]*

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে দোকান বা ঘর ভাড়া হয় আর্থিক জামানত গ্রহণ করে। ভাড়া নেয়ার সময় দোকান বা ভূমির মালিকের কাছে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে দিতে হয়, যাকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাতে স্থান, অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা অনুপাতে তারতম্য হয়ে থাকে। ভাড়াটিয়া মালিককে একসাথে কখনো মোটা অঙ্কের জামানত দেয়, আবার কখনও সামান্য অঙ্কের। তা কখনও ফেরতযোগ্য হয়, আবার কখনও অফেরতযোগ্য হয়। ফেরতযোগ্য জামানত আবার কখনও কর্তনযোগ্য হয়।

---

* প্রভাষক, আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১

মানব জীবনে যত দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেন, তাকে তা পাড়ি দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। আর রাতের অন্ধকার যতই গভীর হোক না কেন, দিনের আলো অনিবার্য। ঠিক তেমনিভাবে কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে সে গভীর রাতের মত দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, কাছের মানুষ তার অচেনা হয়ে পড়ে, সে ভাবতে থাকে তার জীবনে হয়ত বা আর সূর্য্যের ন্যায় আলো আসবে না। কিন্তু রাত-দিনের মালিক তো আল্লাহ। আর আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন ঘটে না। আল্লাহ তাআলা রাত-দিনের যেমন বিভিন্ন বিধি-বিধান দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে মানব জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তাইতো ইসলামকে বলা হয়ে থাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এখানে যেভাবে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনের বিষয়ে বলা হয়েছে, তদ্রুপ এ বন্ধন কোন কারণে ছিন্ন হলেও তার সমাধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানবজাতি তাঁর বিধান লঙ্ঘন করার কারণে পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে মানবিক বিপর্যয়। তাই বিধবা মহিলাগণ লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার। শুধুমাত্র ইসলামী বিধানই দিতে পারে তাদের মুক্তি, মর্যাদা ও অধিকার।

ইসলামী আইনে বিধবা নারীর কর্তব্য

ইসলামী আইনে প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[১] বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়, আবার স্বামীর মৃত্যু ঘটলেও তার বিধবা স্ত্রীর ওপর বিভিন্ন দায়িত্ব ও কতর্ব্য চলে আসে। আর এ কতর্ব্য পালনের মাধ্যমে সে তার মৃত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করার পাশাপাশি তার নিজের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ইদ্দত পালন

ইসলাম বিধবাদের দিয়েছে নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা। জন্মের মাধ্যমে প্রত্যেকের মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়।[২] আর কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে সে স্বাভাবিকভাবেই অসহায়ত্ব বোধ করে। ইসলাম তার এই অসহায়ত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা

---

১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল জুম'আতি, পরিচ্ছেদ : আল-জুমআতুফিল কুরা ওয়াল মুদুন, বৈরূত : দারু ইবনে কাসীর, খ. ১, পৃ. ৩০৪, হাদীস নং-৮৫৩

أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته الإمام راع ومسوول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسوول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسوول عن رعيته . قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسوول عن رعيته وكلكم راع ومسوول عن رعيته

২. আল-কুরআন, ৩ : ১৮৫ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

দূর করার জন্য কিছু বিধান দিয়েছে। যার মাধ্যমে সে নিজেকে পবিত্র করতে পারে ও নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর তা হলো বিধবার ইদ্দত পালন করা।[৩] ইদ্দত পালনের মাধ্যমে বিধবা নিজেকে পবিত্র করার পাশাপাশি পরবর্তী বংশধরের পিতৃ পরিচয় নিশ্চিত করে থাকে। কেননা কোন নারী বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলে তার গর্ভে কোন সন্তান আছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ইসলামের বিধানে সন্তানের প্রকৃত পিতাই পিতৃত্বের দাবীদার। সন্তানের পিতৃত্ব নিশ্চিত হওয়ার জন্য ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইদ্দাতের মাধ্যমে বিধবাকে নির্দিষ্ট কিছু বিধি-বিধান পালনে আদেশ দেয়া হয়েছে। ইদ্দত পালনের মাধ্যমে বিধবা নিজেকে পবিত্র ও সমাজকে করতে পারে।

শোক প্রকাশ করা

ইসলাম একটি স্বভাবজাত জীবন বিধান। এখানে খুশির সময় আনন্দ, আবার দুঃখের সময় শোক প্রকাশের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আবার এ আনন্দ যেন বল্গাহীন না হয় এবং দুঃখও যেন চিরসাথী না হয় তারও বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তাই স্বামী ব্যতীত অন্য কারো মৃত্যুর জন্য সর্বোচ্চ তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করতে

---

৩. ইদ্দত বলতে বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকগণের পুনর্বিবাহের পূর্বে অপেক্ষা করবার নির্ধারিত কালকে বোঝানো হয়।
[সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ. খ. ১, পৃ. ১১৬]
অবস্থার প্রেক্ষিতে ইদ্দতের সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।
স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে তালাক দেওয়া হলে, তাহলে তার কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না।
আল-কুরআন, ৩৩ : ৪৯
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾
স্ত্রীর সাথে মিলনের পর তালাক প্রদান করলে, তাদের তিনটি ঋতুস্রাবপূর্ণ করার মাধ্যমে ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে।
আল-কুরআন, ২ : ২২৮ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিংবা বয়োবৃদ্ধা নারীর তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে।
আল-কুরআন, ৬৫ : ৪
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।
আল-কুরআন, ৬৫ : ৪ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
বিধবা নারীর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।
আল-কুরআন, ২ : ২৩৪
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

নিষেধ করা হয়েছে। আর স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী পরবর্তী চার মাস দশ দিন নিজেকে পবিত্র করার জন্য কিছু বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে এ শোক পালন করবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা, তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই।[৪]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم قَالَ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

উম্মে হাবীবা রা. রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে।[৫]

সাজসজ্জা ও সুগন্ধি পরিহার

ইসলাম বিধবার ইদ্দত-এর সময় অতিরিক্ত সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ করেছে। কেননা ইসলাম নারীদের সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার তার স্বামীকে প্রদর্শনের জন্য করার অনুমতি দিয়েছে, আর ঐ সময়ে সাজসজ্জা ও সুগন্ধি পরিহার সমাজেরও দাবী থাকে। এ সময়ে বিধবা চাকচিক্যময় পোষাক ও অলংকার পরিহার করে স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা।[৬]

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এই সময়ে বিধবা স্ত্রীরা নিজেদের সৌন্দর্য, সুগন্ধি, উত্তম কাপড় এবং অলংকার পরিধান থেকে বিরত রাখবে। আর এটা পালন করা তাদের জন্য ওয়াজিব।[৭]

---

৪. আল-কুরআন, ২ : ২৩৪

৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ত্বলাক, পরিচ্ছেদ : বাবুল কুহলি লিল হাদ্দাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৪৩, হাদীস নং-৫০২৫

৬. আল-কুরআন, ২ : ২৩৪

৭. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, তাহকীক : সামী ইবনে মুহাম্মদ আস সালামাহ, রিয়াদঃ দারু আত্তায়্যেবা, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৬৩৮

এ সময় সুগন্ধি পরিহার প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار .

উম্মে আতিয়্যা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিষেধ করা হত, আমরা যেন কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন না করি। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে হবে এবং (এ সময়) আমরা যেন সুরমা ও খোশবু ব্যবহার না করি আর রঙিন কাপড় যেন পরিধান না করি। তবে হাল্কা রঙের হলে দোষ নেই। আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আমাদের কেউ যখন হায়েয শেষে গোসল করে পবিত্র হয়, তখন সে (দুর্গন্ধ দূরীকরণার্থে) আযফার নামক স্থানের কুস্ত (সুগন্ধি) ব্যবহার করতে পারে।[৮]

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া

ইসলাম বিধবা নারীদের পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং মানবজাতিকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা ও সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিবাহ করতে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা।[৯]

অত্র আয়াতের يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ অংশের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনে জারীর আত-তাবারী রহ. বলেন, তারা ইদ্দত পালন অবস্থায় নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে স্বামী গ্রহণ থেকে, সুগন্ধি ও সাজ-সজ্জা থেকে, স্বামীর জীবদ্দশায় তারা যে গৃহে বাস করত, সে গৃহ থেকে অন্যত্র গমন করা থেকে।[১০]

---

৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : বাবুল কুসতি লিল হাদ্দাতি ইনদাত তুহরি, প্রাগুক্ত, খ. ৫ম , পৃ. ২০৪৩, হাদীস নং-৫০২৭
এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل "

ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : ফিমা তাজতানিবুহুল মুতাদ্দাতি ফি ইদ্দাতহা, বৈরুত : দারুল ফিকর, খ. ১, পৃ. ৭০৩, হাদীস নং ২৩০৪

৯. আল-কুরআন, ২ : ২৩৪

১০. আবু জা'ফার মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান*, খ. ২৩, পৃ. ২৪১

মহান আল্লাহ অন্য স্থানে ইরশাদ করেন,

﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَن تَقُولُوا قَوْلا مَّعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾

আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজেদের অন্তরে কোন সংকল্প লুকিয়েরাখোল, তবে তাতেও কোন পাপ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছ করো না। আর একথা জেনে রেখো যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।[১১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনে কাসীর রহ. বলেন, বিধবার ইদ্দত পালন করার সময় বিবাহতো করা যাবেই না; বরং বিবাহের অঙ্গীকারও করা যাবে না। তবুও কেউ যদি ঐ সময় বিবাহর করে নেয় এবং সহবাসও করে, তবে তাদের পৃথক করে দিতে হবে। তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর মোহর আদায় করতঃ তারা পরস্পর ইচ্ছা করলে বিয়ে করতে পারবে।[১২]

স্বামীর গৃহে অবস্থান

স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী স্বামীর গৃহে অবস্থান করে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করবে এবং স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর গৃহে এক বছর পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

যারা তোমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা, তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই।[১৩]

---

১১. আল-কুরআন, ২ : ২৩৫

১২ ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল আযিম*, তাহকীক, সামী ইবনে মুহাম্মদ আস সালামাহ, রিয়াদঃ দারু আত্তাইয়্যেবা, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৬৩৬

১৩. আল-কুরআন, ২:২৩৪

আর যদি বিধবা কোনো প্রয়োজনে স্বামীর গৃহ ব্যতীত অন্য স্থানে ইদ্দত পালন করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف . قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج.قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها

মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী: "তোমাদের মধ্যে যারা বিবিদেরকে রেখে মারা যাবে" (আল-কুরআন, ২ : ২৪০) তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করে ইদ্দত পালন করা মহিলার জন্য ওয়াজিব ছিল। পরে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন: "তোমাদের মধ্যে যারা বিবিদেরকে রেখে মারা যাবে, তারা বিবিদের জন্য অসিয়ত করবে, যেন এক বৎসরকাল সুযোগ-সুবিধা পায় এবং গৃহ হতে বের করে দেয়া না হয়, তবে যদি তারা নিজেরাই বের হয়ে যায়, তবে তোমাদের প্রতি গোনাহ নেই তারা নিজেদের ব্যাপারে বৈধভাবে কিছু করলে।" (আল-কুরআন, ২ : ২৪০)। মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা (আরো) সাত মাস বিশ রাত (যোগ করে) তার পূর্ণ এক বছরকাল থাকার ব্যবস্থা করেছেন। (এ সময়) মহিলা ইচ্ছা করলে ওসিয়ত অনুসারে পূর্ণ বছর থাকতে পারে, আবার সে ইচ্ছে করলে বেরও হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾ (তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই)-এর মর্মার্থ হলো এটাই। তাই মহিলার উপর ইদ্দত পালন করা যথারীতি ওয়াজিব। আবূ নাজিহ এ কথাগুলো মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আত্বা বলেন, ইবনু আব্বাস রা. বলেছেন : এ আয়াতটি স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করার নির্দেশকে রহিত করে দিয়েছে। অতএব, সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করতে পারে। আতা বলেন: ইচ্ছা হলে ওসিয়ত অনুযায়ী সে স্বামীর পরিবারে অবস্থান করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে অন্যত্রও ইদ্দত পালন করতে পারে। কেননা, মহান আল্লাহ বলেছেন: "তারা নিজেদের জন্য বিধিমত যা করবে, তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।" আতা বলেন, এরপর মিরাছের আয়াত অবতীর্ণ হলে 'বাসস্থান দেয়ার' হুকুম রহিত হয়ে যায়। এখন সে যেখানে চায় ইদ্দতপালন করতে পারে, তাকে বাসস্থান দেয়া জরুরী নয়।[১৪]

---

১৪. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, তাহকীক : সামী ইবনে মুহাম্মদ আস-সালামাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৪৬; ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-ত্বালাক্ব, পরিচ্ছেদ : আল্লাহর

সন্তানের ভরণ-পোষণ

স্বামীর অবর্তমানে সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব স্ত্রীর উপরে বর্তায়। সে তার অথবা তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তাদের লালন-পালন করবে। পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স ১৯৮৫ অনুযায়ী, পিতা অক্ষম বা দরিদ্র হলে মা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾

যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে।[১৫]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه و سلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار

আয়িশাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ভিখারিণী দু'টি শিশু কন্যা সঙ্গে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইল। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিল। এরপর ভিখারিণী বেরিয়ে চলে গেলে নবী স. আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন, যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয়, সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে আড় হয়ে দাঁড়াবে।[১৬]

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله (تزوجت يا جابر) فقلت نعم فقال (بكرا أم

বাণী : ওয়াল্লাজিনা ইউতাওয়াফফাওনা মিনকুম ওয়াজারুনা আয ওয়াজা... প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৪৪, হাদীস নং-৫০২৯

১৫. আল-কুরআন, ২ : ২৭৪

১৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : যাকাত, পরিচ্ছেদ : ইত্তাকুন্নারা ওয়ালাও বিশিক্কি তামরাতিন ওয়ালকালীলি মিনাস সাদাকাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং-১৩৫২

এ প্রসঙ্গে হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে,

عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة ؟ أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم

ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : যাকাত, পরিচ্ছেদ : বাবু ফাদলুন নাফাকাতি ওয়াস সাদাকাতি আলাল আকরাবীন, বৈরুত : দার ইয়াহইয়া আত তুরাস, খ. ২, পৃ. ৬৯৫, হাদীস নং-১০০১

ثيبا) . قلت بل ثيبا قال (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك تضاحكها وتضاحكك) . قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال (بارك الله لك أو قال خيرا

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা সাত অথবা নয়টি কন্যা রেখে মারা যান। তারপর আমি এক প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করি। রাসূলুল্লাহ স. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবির! তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : কুমারী না প্রাপ্তবয়স্কা? আমি বললাম, প্রাপ্তবয়স্কা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কুমারী বিবাহ করলে না, যাতে তার সাথে তুমিও ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে কৌতুক করতে পারতো? জাবির রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স. কে জানালাম, আব্দুল্লাহ কয়েকটি কন্যা সন্তান রেখে ইন্তেকাল করেছেন, আমি তাদের মতই কুমারী বিবাহ করা পছন্দ করিনি। তাই আমি বয়স্কা মহিলা বিয়ে করেছি, যাতে সে তাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।[১৭]

ইসলামী আইনে বিধবাদের মর্যাদা

ইসলাম বিধবা নারীদের দিয়েছে মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার। যদি কোন বিধবা পুনরায় বিবাহ না করে তার ইজ্জত-আবরু রক্ষা করে তার মৃত স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, ইসলাম তাকেও স্বাগত জানায় এবং তার জন্য বিশেষ মর্যাদা ঘোষণা করে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا

আউফ বিন মালিক আশজায়ী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, আমি এবং কষ্ট ও মেহনতের কারণে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া মহিলা কিয়ামতের দিন দুই আঙ্গুলের মত নিকটবর্তী হব। রাসূলুল্লাহ স. তর্জনী ও মধ্যমা পাশাপাশি করে দেখালেন। বংশীয় কৌলিন্য ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী যে বিধবা নারী প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ইয়াতিম সন্তানদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে।[১৮]

---

১৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : নাফাকাত, পরিচ্ছেদ : আওনুল মার'আতি জাওযিহা ফী ওয়ালাদিহি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫৩, হাদীস নং-৫০৫২

১৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : ফিমা তাজতানিবুহুল মুতাদ্দাতি ফি ইদ্দাতিহা, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫০২, হাদীস নং ৫১৫১

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ تَأْتِي امْرَأَةٌ تُبَادِرُنِي فَأَقُولُ لَهَا: مَا لَكِ؟ وَمَا أَنْتِ؟ فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى أَيْتَامٍ لِي

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমিই ঐ ব্যক্তি যার জন্য সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে। কিন্তু এক মহিলা এসে আমার আগে জান্নাতে যেতে চাইবে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো যে, তোমার কী হল? তুমি কে? তখন সে বলবে, আমি ঐ মহিলা যে স্বীয় ইয়াতিম বাচ্চার লালন পালনের জন্য নিজেকে আটকে রেখেছি (বিবাহ করা থেকে)।[১৯]

অপর একটি হাদীসে বিধবা ও ইয়াতিমদের যারা সাহায্য সহযোগিতা করে, তাদেরকে মুজাহিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار

আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী সা. বলেছেনঃ বিধবা ও মিসকিনের জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়াম পালনকারীর মত।[২০]

ইসলামী আইনে বিধবাদের অধিকার

বৈধব্য হচ্ছে জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত একটি পরিণতি। এই পরিণতি অত্যন্ত দুঃখের। মানব জীবনের এই অবস্থাতে সে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ নারীর জীবন যেখানে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, সেখানে বিধবাবস্থা নারীর জীবনে দুর্যোগ নিয়ে আসে।[২১] ইসলাম পূর্ব আরবে বিধবাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হত। কোন নারী বিধবা হলে তাকে তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে কোন অংশ দেয়া হত না; বরং তাকেই সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করে তার উত্তরাধিকারীরা তার সম্পত্তি ও তাকে ভোগ করত।[২২] তাকে নির্জন ঘরে এক বছর যাবত আবদ্ধ করে রাখা হত এবং বছর শেষে পশু-পাখির বিষ্ঠা নিক্ষেপের মাধ্যমে

---

১৯. হাফিজ ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন আত-তামীমী আবি ইয়ালা, *মুসনাদে আবি ইয়ালা*, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : ফিমা তাজওতানিবুহুল মুতাদ্দাতি ফি ইদ্দতিহা, বৈরূত : দারুল মামুন, খ. ১৩, পৃ. ৫

২০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : নাফাকাত, পরিচ্ছেদ : ফাদলিন নাফাকাতি আলা আহলি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৪৭, হাদীস নং-৫০৩৮

২১. গাজী শামসুর রহমান, *মানবাধিকার ভাষ্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৫২০

২২. আল-কুরআন, 8:১৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

বের হয়ে আসতে হত।[২৩] ইসলাম বিধবাদের এই করুণ অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাদের দিয়েছে সম্মান ও অধিকার।

ভরণ-পোষণের অধিকার

ইসলাম বিধবাদের ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার দিয়েছে। বিধবা নারী তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার রাখে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾

আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে।[২৪]

আর যদি বিধবা নারীর নিজের ও সন্তানের ভরণ-পোষণের কোন অবলম্বন না থাকে, তাহলে রাষ্ট্র তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। রাষ্ট্র তাদের আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের অভাব-অনটন দূর করবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغار والله ما

---

২৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ত্বলাক, পরিচ্ছেদ : তুহিদ্দুল মুতাওয়াফ্ফা আনহা আরবাআতা আশহুরি ওয়াশারা, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৪২, হাদীস নং-৫০৪২

عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا . مرتين أو ثلاثا . كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها و لم تمس الطيب حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك ما تفتض ؟ قال تمسح به جلدها .

২৪. আল-কুরআন, ২ : ২৪০

ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي مع النبي صلى الله عليه و سلم فوقف عمر ولم يمض ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها ؟ قال عمر ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحان نستفيء سهمانهما فيه

আসলাম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সঙ্গে বাজারে বের হলাম। সেখানে একজন যুবতী মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার স্বামী ছোট একটা বাচ্চা রেখে ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহর কসম, তাদের আহারের জন্য পাকানোর মত কোন বকরীর খুরাও নেই এবং নেই কোন ফসলের ব্যবস্থা ও দুধেল উট, বকরী। ভীষণ অভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে। অথচ আমি হলাম খুফাফ ইবনু আয়মা গিফারীর কন্যা। আমার পিতা নবী স. এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা শুনে উমর রা. তাঁকে অতিক্রম না করে পার্শ্বে দাঁড়ালেন। এরপর বললেন, তোমার গোত্রকে ধন্যবাদ। তারা তো আমার খুবই নিকটের মানুষ। এরপর তিনি বাড়িতে এসে আস্তাবলে বাঁধা উটের থেকে একটি মোটা তাজা উট এনে দুই বস্তা খাদ্য এবং এর মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও বস্ত্র রেখে এগুলো উক্ত উটের পিঠে উঠিয়ে দিয়ে মহিলার হাতে এর লাগাম দিয়ে বললেন, তুমি এটি টেনে নিয়ে যাও। এগুলো শেষ হওয়ার পূর্বেই হয়তো আল্লাহ তোমাদের জন্য এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি তাকে খুব বেশি দিলেন। উমর রা. বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। আল্লাহর কসম, আমি দেখেছি এ মহিলার আব্বা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি দূর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন এবং পরে তা জয়ও করেছিলেন। এরপর ওই দূর্গ থেকে অর্জিত তাঁদের অংশ থেকে আমরাও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দাবি করি (এবং কিছু অংশ আমরা নিজেরা গ্রহণ করি এবং কিছু অংশ তাদেরকে দেই।)[২৫]

ইজ্জত-আবরু নিয়ে জীবন-যাপনের অধিকার

ইসলাম বিধবা নারীকে ইজ্জত-আবরু নিয়ে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্বাভাবিকভাবে সে অসহায়বোধ করে ও নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটায়। এই সুযোগে অনেকেই তাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তাদেরকে বিয়ের

---

২৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ : গাযওয়াতুল হুদাযবিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫২৭, হাদীস নং-৩৯২৮

প্রলোভন দেখায় ও অশোভনীয় আচরণ করে থাকে। ইসলাম এহেন আচরণ করতে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾

আর যদি তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সে নারীর বিয়ের পয়গাম দাও, কিংবা নিজেদের মনে কোন আকাঙ্খা লুকিয়ে রাখ, তবে তাতেও কোন পাপ নেই, আল্লাহ জানেন যে, তোমরা অবশ্যই সে নারীদের কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদের সাথে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের নির্ধারিত প্রথা অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছ করো না। আর একথা জেনে রেখ যে, তোমাদের মনে যে কথা রয়েছে, আল্লাহর তা জানা আছে। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।[২৬]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن عباس. يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وأن الله لسائق إليك خيرا أونحو هذا وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول أن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وأن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد أن يفرق بينهما

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রা. বলেন: যদি কোন ব্যক্তি ইদ্দত পালনকারী কোন মহিলাকে বলে যে, আমার বিবাহ করার ইচ্ছা আছে। আমি কোন সতী মহিলাকে পেতে ইচ্ছা পোষণ করি। কাসিম রহ. বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেন কোন ব্যক্তি বলল, তুমি আমার কাছে খুবই সম্মানিতা এবং আমি তোমাকে পছন্দ করি। আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণ বর্ষণ করুন। অথবা এই ধরনের উক্তি। আতা রহ. বলেন, বিবাহের ইচ্ছা ইশারায় ব্যক্ত করা উচিত, খোলাখুলি এই ধরনের কোন কথা বলা ঠিক নয়। কেউ এ ধরনের কথা বলতে পারে যে, আমার এ সকল গুণের প্রয়োজন আছে। আর আপনার জন্য সুখবর, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য আপনি পুনঃবিবাহর উপযুক্ত। সে মহিলাও বলতে পারে, আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি কিন্তু এর বেশি ওয়াদা করা ঠিক নয়। তার অভিভাবকদেরও তার অজ্ঞাতে কোন প্রকার ওয়াদা দেয়া ঠিক নয়।

---

২৬. আল-কুরআন, ২ : ২৩৫

কিন্তু যদি কেউ ইদ্দতের মাঝে কাউকে বিবাহের কোন প্রকার ওয়াদা করে এবং ইদ্দত শেষে সে ব্যক্তি যদি তাকে বিবাহ করে তবে সেই বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে না।[২৭]

ইসলাম বিধবাদের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা প্রদান করেছে। জাহিলী যুগের ন্যায় পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্র কর্তৃক বিধবা স্ত্রীদের বিবাহ নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن البراء بن عازب قال مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحرث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه و سلم لواء فقلت له أين تريد ؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মামা আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (রাবী হুশাইম তাঁর বর্ণিত রিওয়ায়েতে বারা' ইবনু আযিব রা. -এর মামার নাম হারিছ ইবনু আমর উল্লেখ করেছেন।) রাসূলুল্লাহ স. তাঁর জন্য একটি ঝাণ্ডা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. আমাকে এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তাকে হত্যা করি।[২৮]

অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলামী আইন বিধবা নারীদের যে সকল অধিকার দিয়েছে, তার মধ্যে অর্থনৈতিক অধিকার অন্যতম। ইসলাম প্রত্যেক বিবাহিতা নারীর মোহরের[২৯] অধিকার দিয়েছে।

---

২৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম ফিমা.. , প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৬৮

২৮. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* তাহকীক : মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : হদ্দ, পরিচ্ছেদ : মান তাযাওয়াজা ইমরাআতা আবী হি মিম বা'দি, বৈরূত : দারুল ফিকর, খ. ২, পৃ. ৮৬৯, হাদীস নং ২৬০৭

২৯. মোহর আরবী শব্দ, অর্থ-স্বেচ্ছাকৃত দান। মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহের চুক্তিকালে বর কর্তৃক কন্যাকে যে অর্থ দেয়া হয় তাই মোহর এবং তা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। ইসলাম পূর্বকালে মোহর ওয়ালীর হাতে অর্থাৎ পিতা, ভাই বা যে আত্মীয়ের অভিভাবকত্বে কন্যা থাকত তার হাতে প্রদান করা হত। স্ত্রী মোহরের কিছুই পেতনা। ইসলামে মোহর ব্যতীত যে কোন বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হয়। মোহরের পরিমাণ স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতার ভিত্তিতে নির্ধারিণ হবে। ইসলামে মোহর দু ভাবে নির্ধারণ করা হয়। নির্দিষ্ট মহর, বিবাহের সময় যে মেহরের পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত থাকে, আর অনির্দিষ্ট মোহর বিবাহের সময় নির্দিষ্ট থাকে না।
[সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৯-১৯০]

ইসলামী আইনে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বিবাহের সময়ই সন্তুষ্টচিত্তে মোহর পরিশোধের নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর খুশীমনে দিয়ে দাও।[৩০]

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রহ. উল্লেখ করেন,

> وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا . وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة وقال سهل قال النبي صلى الله عليه و سلم ولو خاتما من حديد
>
> আর অধিক মোহর এবং সর্বনিম্ন মোহর কত? - এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এবং তোমাদের যদি তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না" (আল-কুরআন, ০৪ : ২০) এবং আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "অথবা তোমরা তাদের মোহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দাও"। (আল-কুরআন, ০২ : ২৩৬)" সাহল রা. বলেছেন, নাবী সা. এক ব্যক্তিকে বললেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবে মোহর হিসাবে যোগাড় করে দাও।[৩১]

আর যদি বিবাহে মোহর নির্ধারণ না হয়ে থাকে এবং স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ঐ বিধবাকে মেহরে মিছল[৩২] প্রদান করতে হবে।[৩৩] মোহর পরিশোধ সম্পর্কে হাফিয ইবনে কাসীর রহ. উল্লেখ করেছেন, "স্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে স্বামীগণ মোহর বিবাহের

---

৩০. আল-কুরআন ৪ : ৪
এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন,
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
আল-কুরআন ৪ : ২৪
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

৩১. বুখারী, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

৩২ মোহরে মিছল হচ্ছে যে বিয়েতে মোহরের পরিমাণ যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয় না; বরং স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা, পারিবারিক মর্যাদা, স্ত্রীর বোন অথবা পিতার পরিবারের অন্যান্য কন্যা যথা: ফুফুর মোহরের অনুপাতে এবং গুণাগুণ অনুসারে যে মোহর প্রদান করা হয়। যে সব ক্ষেত্রে বিয়েতে লেনদেন নির্দিষ্ট করা হয় না, সে সব ক্ষেত্রে এই মোহর মিছলই নির্ধারিত হবে। [সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১৯০]

৩৩. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : নিকাহ, পরিচ্ছেদ : ইবাহাতু তাযাওয়াজু বিগায়রি সাদাক্বি, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-ইলমিয়্যাতি, খ. ৩, পৃ. ৩১৬, হাদীস নং-৫৫১৫

পরও পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু মহর পরিশোধের পূর্বেই যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তবে স্ত্রীর স্বামী নিকট মোহর বাবদ ঋণী হয়ে থাকবে। তাই স্ত্রী তার ঋণ আদায়ের জন্য স্বামীর সম্পত্তি আটক করার অধিকার রাখে।[৩৪] এ প্রসঙ্গে মুসলিম আইন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, "কোন মৃত মুসলমানের উত্তরাধিকারীরা দেনমোহর ঋণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়। মৃতের কাছে প্রাপ্য অন্যান্য ঋণের মত দেনমোরের ঋণেও উত্তরাধিকারীর মৃতের সম্পত্তিতে প্রাপ্য অংশের আনুপাতিক হারে প্রত্যেক উত্তরাধিকারী দায়ী হবে। কোন মহিলার স্বামীর সম্পত্তি তার দখলে থাকলে স্বামীর অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা তাদের নিজ নিজ অংশের দখল উদ্ধার করতে পারবে। একজন মুসলমান এক বিধবা, একপুত্র ও দু'কন্যা রেখে মারা যায়। বিধবা ৩২০০ টাকার দেনমোহর ঋণ পাবার অধিকারী। পুত্রের প্রাপ্য অংশ হল ৭/১৬ এবং সে ৭/১৬ এর ৩২০০ = ১৪০০ টাকা দিতে বাধ্য, এবং বিধবার দখলে স্বামীর সম্পত্তি থাকলে পুত্র ১৪০০ টাকা পরিশোধ করে বিধবার থেকে নিজ অংশ নিবে। প্রত্যেক কন্যার প্রাপ্য অংশ হল ৭/৩২ এবং সে বিধবাকে ৭/৩২ এর ৩২০০ = ৭০০ টাকা প্রদান করার পর নিজ অংশ পাবে।[৩৫]

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়কে মিরাস প্রাপ্তির অধিকার দিয়েছে এবং তাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ রয়েছে।[৩৬] পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ রয়েছে, ভাইয়ের সম্পত্তিতে বোনের অংশ রয়েছে, সন্তানের সম্পত্তিতে মায়ের অংশ রয়েছে।

عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة

৩৪. ইবনে কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, তাহকীক : সামী ইবনে মুহাম্মদ আস-সালামাহ, প্রাগুক্ত, ১৯৯৯, খ. ১, পৃ. ৬৩৬

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আল-কুরআন, ২ : ২৩৬-২৩৭

৩৫. গওছুল আলম, *মুসলিম আইন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯, পৃ. ২৭১-২৭২

৩৬. আল-কুরআন, ৪ : ৩২

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

তদ্রুপ মৃত স্বামীর সম্পত্তিতেও স্ত্রীর নিধারিত অংশ রয়েছে।[৩৭] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾

স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ।[৩৮]

আলোচ্য আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে,

عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يارسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله و لم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يارسول الله ؟ فوالله لاتنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " يقضي الله في ذلك " قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية فقال

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন

আল-কুরআন, ৪ : ৫৭

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

৩৭. পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ

আল-কুরআন ৪ : ১১

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

সন্তানের সম্পত্তিতে মাতার অংশ

আল-কুরআন ৪ : ১১

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশ

আল-কুরআন ৪ : ১২

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

ভাইয়ের সম্পত্তিতে বোনের অংশ

আল-কুরআন, ৪ : ১২

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

৩৮. আল-কুরআন, ৪ : ১২

رسول الله صلى الله عليه و سلم " ادعوا لي المرأة وصاحبها " فقال لعمهما "أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك .قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বেরিয়ে আল-আসওয়াফ নামক স্থানে এক আনসারী মহিলার নিকট উপস্থিত হই। তখন ঐ মহিলা তার দু'টি মেয়েকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা সাবিত ইবনু কায়িস রা.-এর কন্যা। এদের বাবা আপনার সাথে ওহুদের যুদ্ধে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। এদের চাচা এদের সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়ে গেছে। এদের জন্য কোন কিছু রাখেনি। সম্পদ ছাড়া তো এদের বিয়ে দেওয়া যাবে না। (অর্থাৎ সহায়-সম্পত্তিহীন এ মেয়েদেরকে কেউ বিয়ে করবে না।) রাসূলুল্লাহ স. বললেন: আল্লাহ এ ব্যাপারে ফয়সালা করবেন। তখন মীরাসের আয়াত নাযিল হয়। মীরাসের আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ স. মেয়েদের চাচার কাছে লোক পাঠিয়ে বলেন : সাবিতের মেয়েদের তাঁর সম্পদের তিন ভাগের দু'ভাগ দিয়ে দাও এবং তাদের মাকে আট ভাগের একভাগ দাও। আর বাকী অংশ তোমার। ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন, বর্ণনাকারী বিশর ভুল করেছেন। আসলে মেয়ে দু'টি সা'দ ইবনু রবী রা. এর কন্যা। কারণ সাবিত ইবনু ক্বায়িস রা. শহীদ হন ইয়ামামার যুদ্ধে।[৩৯]

মতামত প্রকাশের অধিকার

ইসলাম একটি সহজাত ধর্ম। কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্বভাবতই সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের মতামত প্রকাশের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এই সুযোগে অনেকেই তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাই ইসলাম বিধবাদের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য তাদের মতামতের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী ইদ্দত পালনের মাধ্যমে তার গর্ভে সন্তানের অস্তিত্ব নিশ্চিত করে থাকে। কিন্তু বিধবা নারীর ঐ সময়ের মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ইসলাম ইদ্দত পালনের স্থান নির্বাচনে তার মতামতের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ﴾

অতঃপর যদি সে স্ত্রী নিজ থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই।[৪০]

---

৩৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : ফারাইয, পরিচ্ছেদ : মা যাআ ফী মিরাছিস সুলবি, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৪, হাদীস নং ২৮৯১

৪০. আল-কুরআন, ২ : ২৪০

বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব আসলে তার মতামত ব্যতীত বিবাহ্ শুদ্ধ হবে না। ইসলামী আইনে বিবাহের প্রস্তাবে নারী যদি চুপ থাকে, তাহলে তার সম্মতি রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব আসলে তার মৌখিক সম্মতি প্রয়োজন। কেননা অনেক ক্ষেত্রে তাদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে ও সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া হয়ে থাকে। তাই বিধবা নারীর অধিকার রয়েছে মৌখিকভাবে তার মতামত প্রকাশ করার। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ؟ قال نعم

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন: পূর্ব বিবাহিতা তার (নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে) নিজের ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হক্বদার। কুমারীকে তার থেকে তার সম্মতি নিতে হবে, তার নীরবতাই তার সম্মতি।[৪১]

বিধবা নারীকে জোর-জবরদস্তি করে বিবাহ দিলে, সে বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার তার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد نكاحه

খানসা বিনতে খিযাম রা. থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বিবাহ দিলেন তিনি ছিলেন সায়্যিব (বিবাহিত নারী), তিনি তা অপছন্দ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলে তিনি এ বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন।[৪২]

বিবাহের অধিকার

ইসলাম বিধবাদের বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। কোন নারীর স্বামী মৃত্যুবরণ করলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করার পর ঐ বিধবা ইচ্ছা করলে বিবাহ্ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

তারপর যখন তারা ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই।[৪৩]

---

৪১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : নিকাহ, পরিচ্ছেদ : ইসতি'জানি সাইবি ফিন নিকাহি বিন নুত্বক্বি ওয়ালবিকরি বিছ সুকুত, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০৩৭, হাদীস নং ১৪২১

৪২. আবূ আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আস সায়্যিবু ইযাওয়াযুহা আবুহা ওয়াহিয়া কা'রিহাতুন, প্রাগুক্ত খ. ৩, পৃ. ২৮৩, হাদীস নং-৫৩৮৩

৪৩. আল-কুরআন, ২ : ২৩৪

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনে জারীর আত-তাবারী রহ. বলেন, "বিধবা নারীরা ইদ্দত কাল অতিবাহিত করার পর সুগন্ধি ব্যবহার, সাজ-সজ্জা ও যে গৃহে তারা ইদ্দত পালন করেছে তা থেকে বের হতে পারবে এবং বৈধ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। আল্লাহ তাআলা তাদের ইদ্দত পালনের পর এসব কাজ তাদের জন্য বৈধ ঘোষণা করেছেন।"[৪৪]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبدالله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم حين استفتته فكتب عمر بن عبدالله إلى عبدالله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك (رجل من بني عبدالدار) فقال لها ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر و عشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر

আবুত্ব ত্বাহির ও হারমালাহ্ ইয়াহইয়া রহ. থেকে বর্ণিত, উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ রাহ, 'উমার ইবনু আবদিল্লাহ ইবনুল আরক্বাম আয-যুহরীকে নির্দেশ দিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন সুবয়া'আহ বিনতু হারিস আসলামীর কাছে চলে যান। এরপর তাকে তার হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ফাতওয়া চাইছিলেন এবং তিনি তাকে যা বলেছিলেন তখন উমর ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাকে লিখে পাঠালেন যে, সুবায়'আহ তাকে জানিয়েছেন- তিনি বানূ আমির ইবনু লুঈ গোত্রের সা'দ ইবনু খাওলার স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী এবং বিদায় হজ্জের সময় ওফাত পান। সে সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তার স্বামীর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরেই তিনিই সন্তান প্রসব করেন। এরপর যখন তিনি নিফাস থেকে পবিত্র হলেন, তখন বিবাহের পয়গামদাতাদের জন্য সাজসজ্জা করতে লাগলেন। তখন বানূ আবদুদ্ দার গোত্রের আবূ সানাবিল ইবনু বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাঁর কাছে

---

৪৪. আবু জা'ফার মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ২৪২

০৫. শরী'আহ্ এবং ইসলামী আইনের প্রাথমিক ও প্রধান উৎসসমূহ (এখানে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহ-এর লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া, কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহ্ বর্ণনার উৎস তথা সনদ এবং সনদের স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর)

০৬. ব্যুৎপত্তিগত এবং অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি

০৭. ইসলামী চিন্তার পুনরুত্থান

০৮. সংঘাত ও শান্তিতে শরী'আহ এবং ইসলামের সাধারণ আইনের ব্যবহার উপযোগিতা এবং

০৯. সমসাময়িক আইনি বিষয়ের বিবর্তনমূলক ঘটনাপ্রবাহ।

'ইসলামে মানবাধিকারের মৌলিক ধারণা এবং ন্যায়বিচারের স্থান' দ্বিতীয় অধ্যায়টি মোট ছয়টি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি ভূমিকা ও শেষেরটি উপসংহার; বাকিগুলো হচ্ছে,

১. মানুষের জীবন ও সম্মানের সুরক্ষা
২. ন্যায়বিচার
৩. শরী'আহ্য় রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অবস্থান
৪. মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার সর্বজনীনতা এবং শান্তি ও সংঘাতে মানবাধিকার ও মানুষের মানবিক মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব।

ইসলামে অপরাধ বিজ্ঞান ও দণ্ডবিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখক তাঁর বক্তব্য সাতটি ভাগে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের মত এখানেও একটি ভূমিকা ও একটি উপসংহার ছাড়াও এ অধ্যায়টি পাঁচটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত। যেমন :

১. দণ্ডবিধি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ
২. শরী'আহ প্রদত্ত দণ্ডবিধির বৈশিষ্ট্য; এর অধীনে চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

২.১. আইনি ভিত্তি বা আইনি বৈধতার নীতি (যে কোন দণ্ডই নন্-রিট্রোএক্টিভ[১০], এমন কোন অপরাধ থাকবে না যে সম্পর্কে আইনি বিধান নেই; অন্যদিকে আইনি ভিত্তি ছাড়া কোন অপরাধেরই শাস্তি হবে না)

২.২. নির্দোষিতার পূর্বানুমান (প্রথমে ধরে নিতে হবে যার সম্পর্কে অভিযোগ সে নিরপরাধ)

---

[১০] আইন করা হচ্ছে এখন কিন্তু তা কার্যকর হিসেবে ধরা হবে পূর্বের নির্দিষ্ট একটি সময় থেকে, যেন এ আইন বা দণ্ডবিধি প্রণয়নের পূর্বে কৃত কোন আচরণ তথা অপরাধের জন্য এ আইন বা বিধির অধীনে দণ্ড দেয়া যায়- ইসলামের দণ্ডবিধি এমন পেছন থেকে কার্যকর নয়।

২.৩. আইনের চোখে সকলেই সমান

২.৪. ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের দায়[১১]

৩. শরী'আহ্য় অপরাধ ও দণ্ড (শরী'আহয় নির্ধারিত প্রধান তিন ধরনের শাস্তি) সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

৩.১. হদ্দ, (حد)

৩.২. কিসাস (قصاص) ও

৩.৩. তা'যীর (تعزير)

৪. শরী'আহ্ ও ইসলামী আইনে প্রকৃত অপরাধের বিচারপ্রক্রিয়া বিষয়ক[১২] প্রশ্ন এবং সাক্ষ্য ও প্রমাণ সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

৫. ইসলামের অপরাধ আইনে বিচার (ক্রিমিনাল জাস্টিস[১৩]) এবং সংঘাত-উত্তর বা অন্তবর্তীকালীন বিচারব্যবস্থা (ট্রানজিশনাল জাস্টিস[১৪])

চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ 'ইসলামের আন্তর্জাতিক আইন এবং মানবিক আচরণ ও মানবিক সহায়তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন' অংশে একটি ভূমিকা ও একটি উপসংহার ছাড়াও মোট আটটি উপ-অধ্যায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১. ইসলামী আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন

২. ইসলামী আইন এবং মানবিক আচরণ ও মানবিক সহায়তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন

৩. আগ্রাসন, সমানুপাতে পাল্টা আগ্রাসন[১৫] এবং প্রতিশোধ গ্রহণে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা (এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন:)

৩.১. অনাগ্রাসন বা নন্ আগ্রাসন

৩.২. সমানুপাতে পাল্টা আগ্রাসনে নিষেধাজ্ঞা

৩.৩. প্রতিশোধ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা

---

১১. Individual and other forms of criminal responsibility

১২. প্রসিডিউরাল (Procedural)

১৩. Criminal justice বা 'অপরাধ আইনে বিচার' সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, অপরাধমূলক কাজ নিরুৎসাহিত করা ও কমানো এবং আইন লঙ্ঘনকারী অপরাধীকে শাস্তিপ্রদান ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদির জন্য নির্দেশিত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের কিছু কাজের পদ্ধতিকে বলা হয়। এ ব্যবস্থায় অভিযুক্তের তদন্তকালীন এবং প্রসিকিউশনের ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে সুরক্ষার সুযোগ রয়েছে। উৎস: https://en.wikipedia.org/wiki/ Criminal_justice

১৪. Transitional justice

১৫. প্রপরশনালিটি (Proportionality)

৪. নিষেধাজ্ঞা এবং নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সুরক্ষা (এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন:)

৪.১. মুসলিমের হাতে মুসলিম হত্যায় নিষেধাজ্ঞা

৪.২. শিশু হত্যায় নিষেধাজ্ঞা

৪.৩. আত্মহত্যায় নিষেধাজ্ঞা

৪.৪. ধর্মীয় স্থানসমূহের সুরক্ষা

৪.৫. পবিত্র কালসমূহের (Period) পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখা

৪.৬. কূটনীতিক ও রাষ্ট্রীয় দূত হত্যায় নিষেধাজ্ঞা

৫. তালিবানদের লয়া[১৬]

৬. জিহাদ ও শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে শরী'আহ্র নিয়ন্ত্রণ[১৭] (এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে -)

৬.১. জিহাদের পরিচয়

৬.২. জিহাদের প্রকৃতি

৬.৩. 'জিহাদ' কথাটির বিবর্তনশীল অর্থ

৬.৪. বিদ্রোহ

৬.৫. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত সন্ত্রাস ও সহিংস আচরণ এবং জিহাদ

৭. সমসাময়িক মুসলিম সংঘাত ও সশস্ত্র যোদ্ধা (কমব্যাটেন্ট[১৮]) সম্পর্কে বিবরণ

৮. সমঝোতা ও পুনঃমৈত্রী প্রতিষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ 'শরী'আহ, ইসলামী আইন এবং সমসাময়িক সংঘাত-উত্তর ও অন্তর্বর্তীকালীন বিচারব্যবস্থা' অংশে একটি ভূমিকা ও একটি উপসংহার ছাড়াও দুটি উপ-অধ্যায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১. সমসাময়িক মুসলিম দেশসমূহে সংঘাত-উত্তর ও অন্তর্বর্তীকালীন বিচারব্যবস্থার প্রয়োগ

২. শিকাগো নীতিমালা; এখানে দুটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে -

২.১. সংঘাত-উত্তর বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক উপাদান এবং নীতিমালা

---

[১৬] (Layha) লয়া অর্থ পার্লামেন্ট বা আইনসভা; এখানে আফগান তালিবানদের নিজস্ব আইনসভা এবং আইনসভায় অনুমোদিত বিধি, যা সরকারের অনুমোদিত নয়।

[১৭] লিমিটেশন (Limitation)

[১৮] যাদেরকে সাধারণভাবে 'জঙ্গী' বলে শ্লেষাত্মক ভাষায় অভিহিত করা হয়।

২.২. সংঘাত-উত্তর বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত মূলনীতিসমূহের বাস্তবায়ন।

এ ছাড়া গ্রন্থটিতে পাঁচটি পরিশিষ্ট রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

পরিশিষ্ট ক: ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জির সময়কালের ধারাবাহিক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পরিশিষ্ট খ: মুসলিম দেশে সশস্ত্র সংঘাত এবং এর প্রকৃতি

পরিশিষ্ট গ: ইসলামী আন্তর্জাতিক বিচার আদালত গঠন সম্পর্কিত আইন

পরিশিষ্ট ঘ: ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ক কায়রো ঘোষণা এবং

পরিশিষ্ট ঙ: আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস মোকাবিলা বিষয়ক ইসলামী সম্মেলন সংস্থার কনভেনশন।

এ ছাড়াও গ্রন্থটিতে একটি নির্ঘণ্ট ও একটি গ্রন্থপঞ্জি রয়েছে, যেখানে এ গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত সকল তথ্যসূত্র উল্লিখিত রয়েছে। তবে মূল গ্রন্থটি শুরুর পূর্বে এতে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের একটি তালিকা এবং একটি এবরিভিয়েশন তালিকা সংযুক্ত রয়েছে। পরিভাষাসমূহের তালিকায় আলোচ্য গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষার সংক্ষিপ্ত এবং ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে।

গ্রন্থটির মূল ভূমিকায় লেখক প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এখানে তার কিছু অংশ স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা অসঙ্গত হবে না; যেহেতু পাঠক এতে একদিকে বইটিতে কী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন, তেমনি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য (Motive) সম্পর্কেও পাঠক সঠিকভাবে উপলব্ধি করবেন। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে লেখকের ভূমিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু আলোচনা করেই গ্রন্থ পর্যালোচনা শেষ করা হল।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন, পশ্চিমা অনেকের কাছেই ইসলামের প্রকৃত পরিচয় অজানা। কেননা ইসলাম তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির কোন উপাদান নয়। এ অজ্ঞতার পাশপাশি যখন কিছু কিছু মুসলিমের ইসলাম পরিপন্থী আচরণ তাদের সামনে প্রকাশ পায়- যার কথা উপরে বলা হয়েছে- পশ্চিমা লোকেরা তার বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তাতে ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভুল বোঝার মাত্রা আরো বেড়ে যায়।[১৯] লেখক এ ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বের কথা তুলে

---

১৯. লেখক উদাহরণ হিসেবে আরো বলেছেন, অজ্ঞতা ও ইসলাম ফোবিয়ার কারণে কোন কোন সমাজে এক ধরনের অনিশ্চিত ও অযৌক্তিক উৎকণ্ঠা দেখা যায়। তারা ভাবে, মুসলিম শক্তি ক্ষমতায় গেলে অভ্যন্তরীণ (Domestic) এবং সকলের জন্য সাধারণ আইনের ক্ষেত্রেও শরী'আহ আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরুন। এখানে কিছু কিছু সমালোচক বলেন, এ দেশের ৬ মিলিয়ন মুসলিম নাগরিক ফেডারেল এবং স্টেট আইনে শরী'আহ আইন গ্রহণ করার জন্য প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতে পারে। সাম্প্রতিক

ধরেছেন যেখানে মুসলিম ও পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীর মাঝে ঐতিহ্যগতভাবেই পার্থক্য রয়েছে। লেখক বলেছেন, পশ্চিমারা এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় ভুলে যায়; সেটা হচ্ছে পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠী এবং মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর জীবনে কালের পরিক্রমায় যে মানবিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে তা একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। এ ভিন্নতার বিষয়টি তারা ভুলে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার, মুসলিম জাতিগোষ্ঠী প্রায় এক শতাব্দী আগে অটোম্যান সাম্রাজ্য বিলুপ্তির পর থেকে তুলনামূলক নিকট অতীতে ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। সে বেড়াজাল থেকে যদিও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ক্রমান্বয়ে মুক্তি পেয়েছে বটে; কিন্তু এখনও তাদের পশ্চিমাদের নতুন সাম্রাজ্যবাদী নীতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। দুঃখজনক হচ্ছে এই নব্য সাম্রাজ্যবাদের কুপ্রভাবেই অধিকাংশ মুসলিম দেশে সেই অটোম্যান-উত্তর সময় থেকেই অগণতান্ত্রিক চরিত্রের সরকারগুলো জেঁকে বসেছে।[২০]

লেখকের মতে, পাশ্চাত্যের অনেকে মুসলিমদের ব্যাপারে যা ধারণা করে বাস্তবে কিছু কিছু মুসলিমের নিজেদেরই ভুল ও সহিংস আচরণ এবং ভুল ধর্মীয় বিশ্বাসের ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতিগোষ্ঠী তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক হিসেবে দেখা গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত অমুসলিমের হাতে যত মুসলিম নিহত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক মুসলিম তাদের স্বধর্মীয়দের হাতে নিহত হয়েছে। তিনি এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, ২০০২ সনে আমেরিকার হামলার মধ্য দিয়ে সাদ্দাম হুসেনের পতনের পর ২০০৩ সন থেকে ইরাকে জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ১৯৭১ সনে বাংলাদেশে গণহত্যা এবং সাদ্দামের শাসনামলে ইরাকে এবং ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় ঐ দু'দেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের কথা বলা যায়।[২১] সাম্প্রতিক সিরিয়ায় যা ঘটছে তা শরী'আহ্ ও ইসলামী আইন

বছরগুলোতে অনেকগুলো স্টেটের আইনসভা (State Legislature) সদস্যগণের অনেকে আদালত যেন আন্তর্জাতিক, যেমন, ইসলামী বা শরী'আহ আইনের প্রয়োগ ঘটাতে না পারে সে জন্য আইনি ব্যবস্থা বা শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী আনার জন্য লবিং করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সনে ওক্লাহোমা স্টেটে এ ধরনের শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। তবে ২০১২ সনে একটি ফেডারেল আপিল আদালত তা বাতিল করে দিয়েছে এ বলে যে, ওক্লাহোমা স্টেট আইনসভা কখনো কোন বিদেশী আইনের কোন কিছু গ্রহণ করেছে এমন কোন নজির নেই; এ ধরনের উদ্যোগের ফলে সেখানে সত্যিকার কোন সমস্যা হওয়া দূরের কথা। অতএব এ ধরনের সংশোধনীর প্রয়োজন নেই।

২০. দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। এখনও এ সব দেশের কোন কোনটিতে গণতন্ত্রের নামে চলছে এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বৈরশাসন। - গ্রন্থ পর্যালোচক

২১. তবে এ সব হত্যাকাণ্ড বা গণহত্যা ধর্মীয় ভুল বিশ্বাসের কারণে হয়েছে তা বলা যায় কি না- এ নিয়ে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। কেননা এ সব হত্যাকাণ্ড সবই হয়েছে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক কারণ এবং সামরিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে। - গ্রন্থ পর্যালোচক

লঙ্ঘনের জ্বলন্ত উদাহরণ।[২২] লেখক বলতে চেয়েছেন, মুসলিম কি অমুসলিম যে কোন নিরীহ বেসামরিক মানুষের প্রতি সহিংস আচরণ ইসলাম পরিপন্থী। সিরিয়ার চলমান ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক মানবিক আচরণ আইন এবং মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন ছাড়া কিছু নয়।

তবে এ সব সহিংসতার প্রেক্ষিতে অনেক দেশে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লেখক বলছেন, সমসাময়িক সহিংসতা-উত্তর অন্তবর্তীকালীন বিচারিক উদ্যোগ এক ধরনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে; পাশাপাশি এটা বিচারহীনতাকে নিরুৎসাহিত করেছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো দায়ী ব্যক্তিদের- যাদের বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে গুরুতর বেআইনী আচরণ করার অভিযোগ রয়েছে- তাদেরকে আইনের আওতায় এনেছে। এ উদ্যোগ শরী'আহ্ এবং ইসলামী আইনের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ, নিরস্ত্র মানুষ হত্যা এবং বিশেষ করে নারী ও শিশু এবং অসুস্থ ও আহত মানুষসহ বেসামরিক লোককে হত্যা, ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস এবং মানুষকে দৈহিক নির্যাতন বা টর্চার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ধরনের আচরণের পক্ষে ইসলামে কোন ওজর বা যৌক্তিকতা[২৩] নেই। এগুলো শরী'আহ্ ও ইসলামী আইনে অপরাধ (Criminal Act) বলে গণ্য।[২৪] কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কিংবা অপর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী ইসলামী পণ্ডিত বা রাজনৈতিক কর্মীর মতবাদ হিসেবে এ ধরনের কাজের পক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা এ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারবে না বা একে বদলাতেও পারবে না। এ ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হতে পারে এবং কখনো কখনো দেখানো হয়ও বটে যে, এ ধরনের কাজের উদ্দেশ্য (Ends) ঐ উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যমকে (Means) যথার্থ প্রমাণ করে। কেননা এ ধরনের কাজ ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে এবং ধর্মীয় কারণে করা হচ্ছে; ঐ কারণ এ ধরনের উদ্দেশ্য (Ends) হাসিলের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এ ধরনের মাধ্যম (Means) ঐ উদ্দেশ্য এবং পাশাপাশি এর উচ্চমূল্যবোধ ও আদর্শিক নীতি অর্জনের পথে নিয়ে যায়। অতএব চূড়ান্ত বিচারে এ ধরনের কাজ যৌক্তিক এবং যথার্থ।[২৫]

---

২২. নিঃসন্দেহে সিরিয়ায় সরকারী ও বিদ্রোহী বাহিনীর মাঝে যা ঘটছে তা ইসলাম পরিপন্থী, তবে তা ইসলামের সাথে সম্পর্কিত কোন কারণে ঘটছে না; ঘটছে রাজনৈতিক ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে। - গ্রন্থ পর্যালোচক

২৩. Excuse and justification

২৪. এ বিষয়ে লেখক এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ।

২৫. এ মতবাদ বা ধারণার উৎস হচ্ছে নিকোলো ম্যাকিয়াভ্যালি, দ্রষ্টব্য IL PRINCIPE: LE GRANDI OPERE POLITICHE (G. M. Anselmi I E. Menetti·trans., ১৯৯২)

উপরিউক্ত সহিংস আচরণের পক্ষে এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করা হলেও ইসলাম এ ধারণা ও যুক্তি গ্রহণ করে না। পবিত্র কুরআনের যে কোন নির্দেশনা এ সিদ্ধান্তই দেয়; যদিও এ ব্যাপারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের ফাতওয়া ভিন্ন রকম। এ সব ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের অধিকাংশেরই এ ধরনের আনুষ্ঠানিক ফাতওয়া (নির্দেশনা) দেয়ার যোগ্যতা নেই। লেখক তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, কোন বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পূর্বশর্ত ও যোগ্যতা থাকা জরুরি। উসামা বিন লাদেনের এ ধরনের যোগ্যতা ছিল না। শুধু তাই নয়, বিন লাদেনের মত মুসলিম বিশ্বে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনের রাজনৈতিক/ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ রয়েছেন যাঁদের এ ধরনের যোগ্যতা নেই। লেখক বলছেন, এ ধরনের ফাতওয়ার অপব্যবহার সারা মুসলিম বিশ্বেই রয়েছে। স্পষ্টত ধারণা করা যায়, লেখক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলতে উসামা বিন লাদেনের মত ব্যক্তিকেই বুঝিয়েছেন।

লেখক নিরপরাধ মুসলিম-অমুসলিমের বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ে আরো বলেছেন, মুসলিম-অমুসলিম বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে সহিংস আচরণ ইসলাম বিরুদ্ধ; সেটা যেভাবেই হোক- কোন গ্রুপ, যেমন, সোমালিয়ার আশ্-শাবাব গ্রুপ[২৬], নাইজেরিয়ার বোকো হারাম[২৭], মালির আনসারে দ্বীন[২৮] এবং আফগানিস্তানের

---

[২৬] হারাকাত আশ্-শাবাব আল-মুজাহিদীন বা Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (HSM; আরবীতে حركة الشباب المجاهدين, সোমালি ভাষায় *Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab*; 'মুজাহিদীন যুব আন্দোলন'), 'আল-শাবাব' নামেই অধিক পরিচিত (Al-Shabaab (আরবীতে الشباب; যুবক), সোমালিয়াভিত্তিক একটি উগ্রপন্থী জিহাদী বা সন্ত্রাসী গ্রুপ। খ্রিস্টীয় ২০১২ সনে এ গ্রুপটি কথিত আল-কায়েদার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে। ২০১৪ সন নাগাদ আল-শাবাবের ৭০০০ থেকে ৯০০০ সশস্ত্র সদস্য ছিল বলে অনুমান করা হয়। চলতি বছর ২০১৫ সন নাগাদ গ্রুপটি সোমালিয়ার অধিকাংশ শহর থেকে পিছু হটে কেবল কিছু পল্লী এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। এ গ্রুপটি সে দেশে সমমনাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক কোর্টস্ ইউনিয়ন (Islamic Courts Union, ICU) এর একটি সশস্ত্র শাখা। তবে ২০০৬ সনে সোমালিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন ফেডারেল সরকার এবং তার ইথিওপিয়ান সহযোগী বাহিনীর হাতে আল-শাবাব পরাজিত হওয়ার পর এটি অনেকগুলো উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আল-শাবাব নিজেদেরকে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণাকারী বলে দাবি করে। এ গ্রুপটি সোমালিয়ার ফেডারেল সরকার এবং সোমালিয়া কেন্দ্রিক আফ্রিকান ইউনিয়ন মিশন (African Union Mission to Somalia, AMISOM)এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র আল-শাবাব'কে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ গ্রুপটির বহু জ্যেষ্ঠ্য নেতার মাথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে। উৎস: https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shabaab_(militant_group)

[২৭] বোকো হারাম (Boko Haram), অফিসিয়াল নাম 'আল ভিলায়াতুল ইসলামিয়া গারব আফরীকিয়্যা' (الولاية الاسلامية غرب افريقيا) অর্থাৎ ইসলামিক স্টেটের পশ্চিম আফ্রিকা

তালিবানদের দ্বারা সংঘটিত সহিংস আচরণ কিংবা ফিলিস্তিনী স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মঘাতী বোমা হামলা- কোনটিই ইসলাম সম্মত নয়।

এ বিষয়ে লেখক আরো বলেছেন, গত কয়েক দশক ধরে এমন বহু যোগ্যতাবিহীন (Unqualified) ফাত্ওয়াদাতা দেখা গেছে যাঁরা, তাঁদের স্বার্থলাভের জন্য শরী'আহ্ এবং ইসলামী আইন বিকৃত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আফগানিস্তানে তালিবানদের জারি করা 'লয়া' (Layha) অর্থাৎ বিধি-বিধানের উল্লেখ করেছেন। তালিবান এমনভাবে তাদের বিধি-বিধান জারি করেছে যেন সেটা হানাফী মাযহাব যেভাবে শরী'আহ্ ও ইসলামী আইন ব্যাখ্যা করেছে সে ব্যাখ্যাকেই ধারণ করেছে। কিন্তু বাস্তবে ইসলামে যুদ্ধ আইনকে সূত্রবদ্ধ আইনে রূপান্তরকারী প্রথম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত প্রখ্যাত হানাফী পণ্ডিত ইমাম শায়বানীর মতে, শরী'আহ্ ও ইসলামে যুদ্ধ

প্রদেশ (ISWAP), প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'জামা'আতু আহলিস্ সুন্নাহ লিদ্-দাওয়া ওয়াল-জিহাদ' (جماعة اهل السنة للدعوة والجهاد), বাংলায় 'ধর্মপ্রচার ও জিহাদের জন্য সুন্নাহভিত্তিক লোকদের দল', উত্তর নাইজেরিয়াভিত্তিক একটি চরমপন্থী ইসলামী দল। এ গ্রুপটি শাদ, নাইজার ও ক্যামেরুনেও সক্রিয়। বর্তমানে এর সক্রিয় সশস্ত্র সদস্যের সংখ্যা আনুমানিক সাত থেকে দশ হাজার। বোকো হারাম ২০১৪ সালে ইরাকের ইসলামিক স্টেটের প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করে। খ্রিস্টীয় ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বোকো হারামের ক্রমবর্ধমান উগ্রপন্থা ২০০৯ সালে নাইজেরিয়ায় সহিংস গণঅভ্যুত্থান ঘটায়; ফলে এর নেতাদের সংক্ষিপ্ত বিচার করে হত্যা করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে কারাগার ভেঙ্গে গণহারে বন্দী পলায়নের ঘটনার পর বোকো হারামের পুনরুত্থান হয়। এ সময় থেকে তারা কৌশলী আক্রমণ শুরু করে- প্রথম দিকে দুর্বল লক্ষ্যবস্তুতে, যা পরবর্তীতে পুলিশ ও জাতিসংঘ অফিসে আত্মঘাতী বোমা হামলায় পরিবর্তিত হয়। এ অবস্থায় ২০১২ সালে সে দেশের সরকারের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পর যুগপৎ নিরাপত্তা বাহিনী এবং বোকো হারামের সশস্ত্র আক্রমণ লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়ে যায়। বিগত ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বোকো হারামের আক্রমণে আনুমানিক তের হাজার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে দশ হাজারই নিহত হয়েছে ২০১৪ সালে।

উৎস: https://en.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram

২৮. আনসারে দীন (Ansar Dine), আররীতে انصار الدين অর্থাৎ দীন বা ইসলামের সাহায্যকারী, মালির একটি ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠী। এর নেতা ইয়াদ আল-ঘালি, যিনি ১৯৯০ এর দশকের একজন বিশিষ্ট তুর‍্যাগ বিদ্রোহী নেতা। আল-কায়েদা ইন দি ইসলামিক মাগরিব (ইসলামী মরক্কো) এর সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়। আনসারে দীন সমগ্র মালিতে শরী'আহ্ আইন চালু করতে চায় বলে ঘোষণা করে। মার্চ ২০১২ সালে এ গ্রুপটির প্রথম সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা ঘটে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ এর দশকে শরীফ উসমান হায়দার-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ মালিতে আনসারে দীন নামে একটি সুফি মতবাদকেন্দ্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ওই আন্দোলন আর বর্তমান আনসারে দীন এক নয়; পূর্বেরটি জঙ্গি আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। উৎস: https://en.wikipedia.org/wiki/Ansar_Dine

আইনের যে মানদণ্ড রয়েছে সে মানদণ্ডের বিচারে তালিবানদের লয়া (Layha) ইসলামী যুদ্ধ আইনের সাথে কেবল আংশিকভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পেরেছে। লেখক জানাচ্ছেন, তালিবানদের লয়া আত্মঘাতী বোমা হামলাকে যথার্থ বলে মনে করে। অথচ আত্মঘাতী হামলা ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা ইসলামে আত্মহত্যা করা অথবা আত্মহত্যার মাধ্যমে বহু মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা একটি অপরাধ।...

লেখকের মতে, গত শতাব্দী থেকে মুসলিম বিশ্ব বেশ কিছু মৌলিক সমস্যায় জড়িয়ে আছে। এখনও পর্যন্ত এগুলোর সমাধান করা যায়নি। লেখক মনে করেন, এগুলোর একটি হচ্ছে ইসলামে আধুনিকতার প্রয়োজনগুলোর এবং আধুনিকতায় ইসলামের দাবিগুলোর খাপ খাওয়ানোর সমস্যা। তিনি মন্তব্য করেন, ইসলাম ও আধুনিকতা বিষয়দুটোকে পাশাপাশি উপস্থাপনই বহু মুসলিমের কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তিনি বলেন, মুসলিম সংস্কারকগণ, বিশেষত যাঁরা পরিবর্তন অর্থাৎ আধুনিকতার প্রয়োজন ইঙ্গিত করতে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন, তাদেরকে সাধারণ মুসলিম এবং সাধারণ মুসলিম পণ্ডিতগণ অনেক সময় তুচ্ছার্থে পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিক বলেন। মুসলিম সেক্যুলারিস্টদেরকে বোঝাতেও এ শব্দটি তারা ব্যবহার করেন।[২৯] যদিও পবিত্র কুরআনে 'ইল্‌ম্ (علم) বা 'জ্ঞান' শব্দটি অথবা এ থেকে উৎসারিত বিভিন্ন শব্দ মোট আট শ আশিবার এসেছে এবং তা সর্বত্র ইতিবাচক অর্থেই এসেছে।

মুসলিম বিশ্বে সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনাবলীর সাথে এক ধরনের ধর্মীয় ও আইনগত তাত্ত্বিক সম্পর্ক দেখানোর পেছনে আর্থ-সামাজিক নানা কারণ ছাড়াও প্রধান দুটি কারণ রয়েছে বলে লেখক মনে করেন। তিনি বলেন, একটি কারণ হচ্ছে সাধারণ মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান প্রাথমিক পর্যায়ের; কিছু কিছু সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জ্ঞান একেবারে নগণ্য (Primitive)। তিনি এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, এর কারণ হচ্ছে মানব উন্নয়নে[৩০] এ সব সমাজ পিছিয়ে আছে। তিনি বলছেন, এ কারণে

---

২৯. পরিবর্তনের পক্ষে কথা বললে মুসলিম পণ্ডিত বা আলেমসমাজের সকলেই সেটাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন না; যতক্ষণ না তাতে শরী'আহ্ বা ইসলামী আইনে ইসলাম অসমর্থিত উপায়ে কোন পরিবর্তন অথবা এর কোন অংশকে বর্জন কিংবা কোন অংশের কুরআন-হাদীস অসমর্থিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়। যাঁরা নিজেদের সেক্যুলারিস্ট বলে পরিচয় দেন কিংবা ইসলামে পরিবর্তন ও সংস্কারের কথা বলেন এবং ইসলাম ধর্মের বিধান নিয়ে প্রশ্ন তুলেন, প্রায়শ দেখা যায় ইসলাম ধর্ম, শরী'আহ্ বা ইসলামী আইন সম্পর্কে তাঁদের সম্যক জ্ঞান নেই। শরী'আহ্, ইসলামী আইন এবং সাধারণভাবে ইসলাম ধর্ম একটি ব্যাপকভিত্তিক জ্ঞানচর্চার বিষয়; এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক গভীর অধ্যয়ন ছাড়া আংশিক বা ভাসাভাসা জ্ঞান দ্বারা বিভ্রান্তিতে জড়ানোর আশঙ্কা থেকেই যায়। -গ্রন্থ পর্যালোচক

৩০. আন্তর্জাতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক ধরনের মানব কল্যাণের ধারণা থেকে মানব উন্নয়ন (Human development) কথাটি এসেছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Programme) মানব উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে: "the process of

কোন কোন মুসলিম দেশে কিছু কিছু কথিত ইসলামী পণ্ডিত, ইমাম বা শায়খ রয়েছেন যাঁরা যতটা না মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিত তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক কর্মী (Actor)। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এগিয়ে নিতে ইসলাম ও শরী'আহ্‌র বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁদের মত করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে নিতে আপত্তি করছে না। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, বর্তমানে এগুলো ঘটছে সোমালিয়া, মালি, নাইজেরিয়া, আফগানিস্তান এবং মিসরে। তাঁর মতে, ভারত ও পাকিস্তানের মুসলিম জনগোষ্ঠী, বিশেষত পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী ওয়াজিরিস্তানের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও এ অবস্থা দেখা যায়। তাঁর ভাষায় রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ইসলামের ব্যাখ্যার সাম্প্রতিক বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ২০১২ সনের সেপ্টেম্বরে রাসূলুল্লাহ্‌ স.-কে অবমাননামূলক ভিডিও ইন্টারনেটে আপলোডের বিরুদ্ধে প্রায় বিশটি মুসলিম দেশে আমেরিকা বিরোধী সহিংস প্রতিবাদের ঘটনা, যখন লিবিয়ায় আমেরিকান দূতাবাসে হামলা করে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা হয়।[৩১] তিনি এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানে মালালা ইউসুফজাই এর উপর পাকিস্তানী তালিবানদের হামলার ঘটনাটিও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, রাষ্ট্রদূত হত্যা করা বা তাকে আহত করা বা বিদেশী সম্পদ ধ্বংস করা শরী'আহ্‌ ও ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ। মালালাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করার ঘটনাটিরও ইসলামে কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই; বরং তা একটি অপরাধ।... এগুলো, লেখকের ভাষায়, ইসলামের নামে সংঘটিত সহিংসতা; কিন্তু এগুলো ইসলামে অনুমোদিত নয়।... তিনি আরো বলছেন, এ ধরনের ঘটনার পেছনে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, হতাশা, ক্রোধ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসহ বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ সক্রিয় রয়েছে। এ ধরনের ঘটনার অনেকগুলোর পেছনে কিছু কিছু ইসলামী পণ্ডিতের বা ইসলামী পণ্ডিত বলে দাবি করেন এমন ব্যক্তিবর্গের অপর্যাপ্ত জ্ঞানও দায়ী, যাঁদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাসূলুল্লাহ্‌ স. তাঁর মদীনার জীবনে এবং পরবর্তী দু'শ বছরে মুসলিম উম্মাহ্‌ ইসলামকে বোঝার যে মানদণ্ড তৈরি ও ব্যবহার করে গেছেন সে মানের চেয়ে নিচের।

---

enlarging people's choices", said choices being allowing them to "lead a long and healthy life, to be educated, to enjoy a decent standard of living", as well as "political freedom, other guaranteed human rights and various ingredients of self-respect." Drm: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_development_(humanity)

৩১. রাষ্ট্রদূত হত্যা ইসলামসম্মত নয়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ স.-কে অবমাননার নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ করা অন্যায় নয়। সব ধর্ম ও ধর্মপ্রচারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা (যে ধর্মের অনুসারী যে আচরণকে অসম্মানজনক মনে করে সে আচরণ পরিহার করাও এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে) জাতিতে জাতিতে এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে সহমর্মিতা ও মৈত্রী- অন্তত অহিংসা প্রতিষ্ঠা এবং তা ধরে রাখার জন্য পূর্বশর্ত- এ কথা কেবল মুসলিমদের মনে রাখতে হবে তা নয়, সব ধর্মের মানুষকেই তা গ্রহণ করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে। তবেই তা অর্থবহ হবে।- গ্রন্থ পর্যালোচক

মুসলিম বিশ্বে সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনাবলীর এক ধরনের ধর্মীয় ও আইনগত তাত্ত্বিক ভিত্তি দেয়ার চেষ্টার পেছনে আরেকটি কারণ রয়েছে, যা ধর্মতাত্ত্বিক ও ইসলামী আইনি মতবাদের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সাথে সম্পর্কিত। কারণটি হচ্ছে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে বারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ইসলামের স্বর্ণযুগে বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে অসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল, মোঙ্গল ও সেলজুকদের হামলার মাধ্যমে কার্যত তার সমাপ্তি ঘটে। সে সময় আব্বাসী যুগের সভ্যতার যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, মোঙ্গল ও সেলজুকদের হামলায় তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। দশম শতকের শুরু থেকে সুন্নী আলেম সমাজ সমসাময়িক অন্যান্য জাতি ও সভ্যতা থেকে আগত নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার পদ্ধতি (যেমন, যুক্তিবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্র, যা গ্রীক সভ্যতা থেকে এসেছিল) ইত্যাদির ব্যাপক আকারে মুসলিম সমাজে প্রবেশের কারণে চিন্তিত হন। একদিকে দক্ষিণ ইউরোপ, পারস্য ও ভারতবর্ষে মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিস্তার এবং বিপরীত দিকে গ্রীস ও বায়জান্টাইন থেকে ঐ সব জাতির ধ্যান-ধারণা, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ধরণ এবং রীতি ও পদ্ধতির মুসলিম সমাজের সাথে মিশ্রণের কারণে তাদের মধ্যে এগুলো প্রবেশের এ অন্তঃপ্রবাহ (Influx) ছিল স্বাভাবিক। এর ফলে মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় অমুসলিমদের উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রভাব পড়ে। এটি বিশেষত আরব থেকে আগত তুলনামূলক অধিক রক্ষণশীল মনোভাবের ধর্মতত্ত্ববিদ বা ইসলামী পণ্ডিতসমাজকে উদ্বিগ্ন করে তুলে। তারা মনে করেন, এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক খোলাদ্বার বা উদার (Openness) নীতি মুসলিম সমাজকে বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনে বিভক্ত করার অন্যতম কারণ। শিয়া-সুন্নী বিভক্তি এবং খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলা আন্দোলন প্রভৃতি ছিল রক্ষণশীল ধর্মীয় পণ্ডিতসমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক খোলাদ্বার নীতির লাগাম টেনে ধরার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত কারণ। এ প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যায় অনমনীয় ভাষাগত বা মূলানুগ (Literalism) বিশ্লেষণকে পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং এতে যুক্তির (Reason or logic) ব্যবহার বন্ধ করা হয়।[৩২] বস্তুত লেখক এভাবে

---

৩২. কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় কেবল শব্দগত অর্থ নয়; তার ব্যবহারিক এবং পরিভাষাগত অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে হাদীসের ব্যাখ্যাকে সামনে রাখা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যার লজিকের ব্যবহার পরিহার করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিশেষত যখন এর অতি ব্যবহার মুসলিম সমাজে একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। আল্লাহ এক ও অনাদি, তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী তাঁর মত অনাদি ইত্যাদি ইসলামের আকীদাগত নানা বিষয় নিয়ে তর্কশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে সত্যাসত্য প্রমাণ করা এবং এ নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার মত নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতগণ যুক্তির ব্যবহার পরিহারের পথ অবলম্বন করেন। -গ্রন্থ পর্যালোচক

ইজতিহাদ[৩৩] বন্ধ করা ও পরবর্তীতে কারো কারো তাতে আপত্তির বিষয়টি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে বিতর্কের তিনি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যা হোক, দৃশ্যত তিনি এভাবে যুক্তির ব্যবহার তথা স্বাধীন ইজতিহাদ কার্যত বন্ধ করে দেয়াকে মুসলিম জগতে সাম্প্রতিক সহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনকে এক ধরনের ধর্মীয় ও আইনগত তাত্ত্বিক ভিত্তি দেয়ার প্রচেষ্টার অন্যতম কারণ বলে ইঙ্গিত করেছেন।

পরিশেষে লেখক এ গ্রন্থটি লেখার পেছনে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পাঁচটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে: এ বিষয়টি পাঠকের সামনে তুলে ধরা যে, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (IHL) এবং মানবিক আচরণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন (IHRL), যা সশস্ত্র ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এবং পাশাপাশি সমসাময়িক সংঘাত-উত্তর ও অন্তবর্তীকালীন বিচারব্যবস্থার নিয়ম ও কৌশল (Mechanism) শরী'আহ ও ইসলামী আইন বা ফিক্‌হের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; পাশাপাশি এ তিনটি বিষয়কে ব্যবহার করা সম্ভব। দ্বিতীয় হচ্ছে, শরী'আহ এবং ইসলামী আইনের মুহাররাম (নিষিদ্ধ), মাকরুহ (অপছন্দনীয়) বিষয় এবং ইসলামী আইনের যে অংশ মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে কিংবা মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে সহিংস আচরণ সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং পাশাপাশি শরী'আহ ও ইসলামী আইনের অধীনে মুসলিমদের আইনগত দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করা। তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কোন ধরনের সংঘাতের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানবিক আচরণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের পর্যবেক্ষণ-সীমা বাড়ানো, সংঘাত-উত্তর এবং অন্তর্বর্তীকালীন বিচারব্যবস্থার নিয়ম ও কৌশলসহ- যার উদ্দেশ্য হবে রিস্টোরেটিভ বিচারব্যবস্থা[৩৪] নিশ্চিত করা এবং অপরাধীকে বা সংঘাত সৃষ্টিকারীকে নিরুৎসাহিত করা, যেন এর মাধ্যমে মানবিক

---

৩৩. اجتهاد Ijtihad ("diligence") ইসলামী আইন সম্পর্কিত একটি পরিভাষা। ইজতিহাদ হচ্ছে কুরআন-হাদীস-ইজমা-কিয়াসের ভিত্তিতে কোন আইনি সমস্যার সমাধান স্বতন্ত্রভাবে খুঁজে বের করা। এটি তাকলীদের বিপরীত। এর জন্য প্রয়োজন কুরআন-হাদীস এবং এ দুটোর ভিত্তিতে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইজমা, এবং কিয়াসের পদ্ধতি ও আরবী ভাষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। এ সব যোগ্যতার অধিকারী একজন মুজতাহিদকে সতর্কতার সাথে আইনি যুক্তি-কিয়াস-ভাষাগত ব্যাখ্যা ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোন আইনি সমস্যার সমাধান বের করতে হয়।

৩৪. রিস্টোরেটিভ জাস্টিস (Restorative justice) অপরাধ আইনের এমন একটি পদ্ধতি, যা অপরাধের শিকার এবং বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তার সমাজের সাথে অপরাধীর সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করে অপরাধীকে পুনর্বাসিত করতে চায়। উৎস: https:// www.google.com.bd/?gws_rd=cr,ssl&ei=JtTSVfjqBMeNuAS1uIHIDQ#q=what+is+Restorative+justice+

বিপর্যয় এবং সম্পদের ক্ষতি কমানো যায়। চতুর্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে, অমুসলিমদেরকে শরী'আহ্ ও ইসলামী আইন সম্পর্কে অবহিত করা। কেননা, লেখকের মতে, ভবিষ্যতের মুসলিম সমাজের স্বরূপ গঠনে অমুসলিম সমাজ ক্রমশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠছে। পঞ্চম উদ্দেশ্য হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্বে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামফোবিয়ার কোন ভিত্তি নেই তা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করা, যারা কিছু মুসলিমের ধর্মীয় ও বর্ণবাদী ঘৃণা সৃষ্টির প্রোপাগাণ্ডাকে জনসমর্থিত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত ঘৃণ্য তৎপরতাকে ছুঁতো বানিয়ে ইসলাম ধর্মের অসম্মান করতে চায় এবং ইসলামকে খাটো করতে চায়। এভাবে ইসলামফোবিয়ার অসারতা প্রমাণ করে পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম উম্মাহর মাঝে সৃষ্ট টানাপোড়েন হ্রাস করাই গ্রন্থটি রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বলা যায়, লেখক এ গ্রন্থটি প্রস্তুত করতে গিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেছেন তা সহজেই অনুমেয়। তিনি অনলাইন ও অফলাইন উভয় উৎস থেকে অগণিত গ্রন্থ ও গবেষণা জার্নাল এবং প্রবন্ধ ও নিবন্ধ অধ্যয়ন করেছেন। তা ছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানবিক আচরণ ও সহায়তা আইন বিষয়ে একজন প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। এ গ্রন্থ রচনায় তিনি তাঁর সে মেধা ও জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে যে সব মূল্যবান টীকা তিনি সংযোজন করেছেন সেগুলোতেও পাঠক অনেক খোরাক পাবেন। তবে লেখকের নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এবং লেখায় তার প্রতিফলন ঘটবে এটি খুবই স্বাভাবিক। আলোচ্য কোন কোন বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অথবা বক্তব্যের সঙ্গে পাঠক যদি একমত না হন তবে তা কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়; এমন হতেই পারে। দ্বিমত প্রকাশ করার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী পাঠক অনেক কিছু জানার ও বোঝার এবং নিজে বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাবেন বলেই আমি মনে করি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্ম তাতে কোন সন্দেহ নেই।

- মুহাম্মদ রাশেদ
সিনিয়র রিসার্চ অফিসার
'সার্চ' SURCH (এ হাউজ অব সার্ভে রিসার্চ)

এক নজরে
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
এর কার্যক্রম

১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন

২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি
গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার
খ. জাতীয় আইন সেমিনার
গ. মাসিক সেমিনার
ঘ. মতবিনিময় সভা
ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক)
গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক)
ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. বুলেটিন

৫. বুক পাবলিকেশন প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা
ঘ. ইসলামী আইন কোড
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. লেখক সম্মেলন

৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
খ. ফিক্হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
ঘ. ই-লাইব্রেরী
ঙ. আইন ওয়েব সাইট

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় ....কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ..

ঠিকানা ঃ..

....

বয়স .... পেশা...

ফোন/মোবাইল ঃ ....সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ....টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

সংস্থার একাউন্ট নং

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

MSA-11051 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।

ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।

এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।

গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন

২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

➪ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ × ৪ = ৪০০/-

➪ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ × ৮ = ৮০০/-

➪ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ × ১২ = ১২০০/-

REG.NO.DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: OCTOBER-DECEMBER : 2015 : Tk. 100/-